উপহার

স্নেহের

বাবী (পুণ্যশ্লোক)

ও

মামণ (রাজশ্রী)-কে

—বাবা

ভূমিকা

বিজ্ঞান বাদে জ্ঞান নেই যেন আজ! কল্পনার পুষ্পকরথ গতকাল যা ছিল উড়োজাহাজ; আজ সে 'পাইওনীয়র' "ভয়েজার"—রূপ নিয়ে চলেছে সৌরমণ্ডলের পরপারে। এ শতাব্দীর শেষপাদে এই সব যান, সৌরমণ্ডলের বহির্বিশ্বের খবর দেবে এ সংবাদ পৌঁচেছে গ্রামে, গঞ্জে, হাটে-বাজারে, চায়ের দোকানে, কৌতূহল সৃষ্টি করেছে বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে।

বহির্বিশ্বের বৈচিত্র্যানুসন্ধানের সাথে আরও প্রবলভাবে উন্মোচিত হয়েছে এই অসীম সৌন্দর্যময়ী পৃথিবী—তার রূপ, ঐশ্বর্য ও রসাম্বুধারার প্রকৃতি; এই পৃথিবীর রসাম্বুর তরল সরল নাম জল—যা অন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও নেই।

শুধু এরই জন্যে জীবন এসেছিল জড়ে। জড় যে জীবন্ত হল শুধু তাই নয়, রসালো অস্তিত্ব নিয়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল—রঙ্গীন চিত্ত-মন-হারী বিহঙ্গ বা পতঙ্গের রূপে, আর মানুষের 'করোটি'-র অন্তস্থ সূক্ষ্ম খাঁজের অসামান্য রূপে স্পন্দিত অঙ্কনে বিধৃত হল তাক্লাবা.. চিন্তাবুদ্ধির মহাশক্তি।

মানবদেহের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জল আর পৃথিবীরও ৭১ শতাংশ জুড়ে আছে এই জল। জলই জীবন, জলই পৃথিবী। জল নেই ত জীবন নেই, পৃথিবীও নেই—আছে উসর প্রান্তর ভরা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা।

আবার পৃথিবীর সকল জলেরই উৎস এক সমুদ্র। ভূ-ত্বকের জল, এমন কি সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপানের' বর্ণনার—'ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল; ·· ··গায়ের রক্ত জ-ল'—সবই সমুদ্র জলেরই (দশ থেকে চল্লিশ হাজার বছরের) এক বিবর্তনের রূপ।

শুধু 'জল' বা 'সমুদ্র' নাম দেওয়া যেতে পারত এ গ্রন্থের—এমন উক্তি কেউ করেছেন। কিন্তু লেখক এ-দুটি শব্দের অন্তর্নিহিত অচ্ছেদ্যতায় বিশ্বাসী হয়ে নামকরণে দু'টিকেই জুড়েছেন 'ও'—সহযোগে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বেতার জগৎ ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছাপার হরফে এবং কলমের রেখায় টুকরো কাগজের বাণ্ডিলে এ গ্রন্থ আদিমরূপে হয়ত থেকে যেত বহুকাল যদি না সর্বশ্রী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমরজিত কর, সংকর্ষণ রায়, মিহির বসু, জে, ঘোষ ও মৃন্ময়ী দাসের সাথে কয়েকটি টেলিভিশন ও রেডিও প্রোগ্রামে লেখককে যোগ দিতে হত এবং জল নিয়ে আবার ভাবনা চিন্তা করতে হত।

এক শারদ সন্ধ্যায় বাংলার মানুষের বহু অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞান-মানস উন্মোচনের তাঁর সচেষ্ট প্রয়াসের কথা লেখককে জানালেন শ্রীঅরুণ কুমার পুরকায়স্থ মহাশয়। সংস্কৃতি-গর্বী বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-চেতনা বিকাশে তাঁর প্রকাশন সংস্থার প্রচেষ্টা বহুলাংশে বাণীমুখী এ প্রত্যয়ার্জানে তাঁর মত উন্নত-মনা প্রকাশকের হাতে বইটির দায়িত্ব সমর্পনে পাঠক-সমাজের প্রতি লেখকের বাকী কর্তব্যটুকুর হয়ত সম্যক সাধন ঘটল।

পাঠকেরা এ গ্রন্থের বহু বিদেশী-শব্দাকীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ছন্দে-তরঙ্গিত জলধির গঠন ও জীবনস্পন্দনের তত্ত্ব রসাস্বাদনে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হলে লেখকের তৃপ্তি স্ফুরিত হবে চন্দ্রাহত অনাবিল সমুদ্র-তরঙ্গ সদৃশ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—

শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বহুরঞ্জিত প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য চিত্র অংকনের জন্য।

শ্রীচারু খাঁন ও শ্রীজীবন ভট্টাচার্য : নানা চিত্র অংকনের জন্য।

শ্রীবিশ্ব নাথ বসাক, গ্রন্থগারিক, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলকাতা : অকুণ্ঠ সাহায্য ও বহু পত্র পত্রিকা গ্রন্থের ফটোকপির সাহায্যের জন্য।

শ্রীমতী অসীমা মিত্র : সংসারের অনেক আশু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এ গ্রন্থনের সময়ারহণের জন্যে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

অনন্যা পৃথিবী

সূচনা

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
……কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু'

—**রবীন্দ্রনাথ**।

অপূর্ব সুন্দর এই পৃথিবী! বৃক্ষে পুষ্পে তৃণে অথবা উষর মরু আচ্ছাদিত এর স্থলভাগ সফেন নীলাম্বু পরিবৃত, তার উপরে সতত-সঞ্চরণশীল মেঘমালা—এই পৃথিবী গোটা সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র প্রাণবতী মহীয়সী রূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এ জন্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ ধরনের গ্রহ দুর্লভ।

'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।'

—**রবীন্দ্রনাথ**।

এতদিন ধারণা ছিল ইনি সূর্যকন্যা, অন্য গ্রহ-উপগ্রহদের সহোদরা। গত পঁচিশ বছরের মহাকাশ গবেষণায় সে ধারণা পাল্‌টেছে। এরা সূর্যোদ্ভব পুত্রকন্যা নয়, সবাই ভাই-বোন। প্রায় পাঁচ শ' কোটি বছর আগে এক অসীম ধূম্রপুঞ্জ থেকে ঘনীভূত হয়ে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহেরা সৃষ্ট হয়েছিল প্রায় একই জন্মলগ্নে।

'গ্রহগুলি ঘোরে নিরন্তর
মধ্যমণি জ্যেষ্ঠভ্রাতার কঠোর নির্দেশে।
অসীম ধূম্রপুঞ্জ হতে জন্ম নিয়ে
অগ্রজকে মেনেছে তারা পিতৃ শ্রদ্ধায়।'

—(**'বেত্রবতী'**)

দ্রষ্টব্য: 'বেত্রবতী' লেখকের কাব্যগ্রন্থ।

অবশ্য উল্কাগুলোর ও চাঁদ-থেকে-আসা পাথরের গবেষণায় সব চাইতে পুরোনো বয়স পাওয়া গেছে ৪৬০ কোটি বছর। যাই হোক, নানাভাবে হিসেব করে সৌরমণ্ডলের বয়স ৫০০ কোটি বছরের কাছাকাছি ভাবা হচ্ছে।

পৃথিবী এত সুন্দর! এত জীবন ধারণ করে আছে অথচ গোটা সৌরমণ্ডলে আর কোথাও জীবনের প্রাণস্পন্দন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভেনেরা-পাইওনীয়ার-ভয়জারের তথ্যে খুঁজে পাননি।

> ‘চিরবন্ধ্যা চন্দ্রিমা জন্ম দেয়নি ত
> কোনো ভ্রূণে কোনোদিনে।
> তাই চেয়ে থাকে অকাতরে পৃথিবীর পানে—তার
> অসংখ্য সন্ততির ’পরে।
> গোটা চাঁদ তাই যেন এক ফোঁটা
> ঝলসানো চোখের জল।’
>
> —(‘বেত্রবতী’)

অন্য কোন গ্রহে জীবন নেই তার প্রধান কারণ এই যে একমাত্র পৃথিবীতেই জল জলীয় অবস্থায় আছে। অন্য কোথাও যা কিছু জল আছে তা হয় গ্যাসীয় নতুবা বরফাবস্থায় বর্তমান। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন—এই বড় গ্রহগুলিতে অনেক প্রকার গ্যাসের বায়ুমণ্ডল আছে কিন্তু জল নেই, বুধে চাঁদের মত বায়ুমণ্ডল নেই। মঙ্গলে খুবই সামান্য পরিমাণ জলীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে স্পেকট্রস্কোপের সাহায্যে। এই জল ছাড়া আছে মাতৃ-স্নেহচ্ছায়ার মত বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল। সৌর তাপে জল সমুদ্রতল থেকে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেঘাকারে আশ্রয় নেয়, তারপর বরফ, বৃষ্টি আকারে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। আবার পরিণতিলাভ করে সমুদ্রের জলে মিলিত হয়ে। এই চক্র চলতে থাকে এবং উদ্ভিদ্ তথা সমগ্র প্রাণীজগতের ধারণ, বিস্তার ও বিবর্তন সাধিত হয়।

জলের এই ধারক সমুদ্রের কথা বলার আগে জলের বাহক মেঘ তথা বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে প্রথমে কিছু বলে নিচ্ছি।

আদিম বায়ুমণ্ডল

আগেই বলেছি যে সৌরজগৎ প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে প্রায়-শীতল ধূলিকণার এক আবর্তিত প্রকাণ্ড মণ্ডল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

> 'টানে ও চাপে থেঁতলে যাওয়া সময়
> চলেছে সম্মুখে এইখানে—
> পাঁচশ' কোটি বছর ধরে
> সূর্যের জন্মলগ্ন হতে।'
>
> —(**'বেত্রবতী'**)।

আবর্তের কেন্দ্রে ঘনীভূত এক বিশাল ধূলিপুঞ্জ থেকে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্রীভূত ভৌমাকর্ষণের ফলে সূর্যেই ৯৯ ভাগের অধিক ভর (mass) ঘনীভূত হয়; বাকী অংশ ছোট ছোট বিভিন্ন কক্ষপথে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে। পৃথিবী তাদের মধ্যে অন্যতম এবং সূর্য থেকে তৃতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য গ্রহের মতন যখন পৃথিবীর ভৌম আকর্ষণে ধূলিকণাগুলো প্রবল বেগে জড়ো হচ্ছিল তখন কণাগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে তপ্ত (কয়েক হাজার ডিগ্রী) হয়ে পড়ে এবং আরও ঘনীভূত হয়ে ভৌম-আকর্ষণে বা অভিকর্ষণ-শক্তি তাপ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে নবজাত পৃথিবীর জড় পিণ্ডকে গলিয়ে ফেলে। এতে সংযোজিত হয়েছিল তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত বিপুল পরিমাণের তাপ-শক্তি। এর ফলে অন্তঃস্থলে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত হয়; যেমন ১·১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে সাড়ে ছ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অন্তঃকেন্দ্র, ম্যাণ্টল ও ভূ-ত্বকে অবস্থিত ভারত, আফ্রিকা, লরেশিয়া ও অন্তর্বর্তী মহাসাগর ইত্যাদি।

এমন অবস্থায় পৃথিবী পিণ্ডের মধ্যে ভারী পদার্থ নিচে ডুবে লৌহ-নিকেল সম্বলিত অন্তঃকেন্দ্রের সৃষ্টি করে; তার উপরে থাকে লৌহ-ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ ম্যাণ্টল এবং তার উপরে ভেসে-ওঠা হাল্কা সিলিকা, এলুমিনিয়ম্, ম্যাগনেসিয়ম ইত্যাদিতে গঠিত হয় সিলিকেট স্তর, তাকে

ভূ-বিদ্‌রা 'সায়াল' (sial) বলেন। পৃথিবীর এই শক্ত আবরণ-স্তর বা ভূ-ত্বক গঠিত হল ৪০০-৪১০ কোটি বছর আগে, আর কেন্দ্রে ঘূর্ণীয়মান গলিত লৌহ-নিকেল পিণ্ড থেকে সৃষ্ট হয় পৃথিবীর প্রথম ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র যা পৃথিবীকে সৌর ঝটিকা-নিঃসৃত মারাত্মক রশ্মি থেকে রক্ষা করতে থাকে।

মহাকাশ থেকে আগত উল্কার গবেষণা করে ও পৃথিবীর রাসায়নিক গঠন সমীক্ষা করে এখন নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে গোটা পৃথিবীর রাসায়নিক গঠন এক ধরনের উল্কা—'কার্বনেসিয়াস কন্‌ড্রাইট' (Carbonaceous chondrite)-এর সমতুল্য। ঐ নব্য-সৃষ্ট শক্ত পৃথিবীর উপরে এক বায়ুমণ্ডলের আস্তরণও গঠিত হয়েছিল যাতে ছিল এমন সব গ্যাস যা প্রধানতঃ বহির্বিশ্বের গ্রহগুলিতে (যেমন বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদিতে) এমনকি বুধেও পাওয়া যায়। ঐ বায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), জল (H_2O) ও নাইট্রোজেন (N_2) এবং এদের সঙ্গে বহুল পরিমাণে ছিল মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি। মোট কথায়, তখন ছিল অম্লজান-লঘু বা বিজারণ জাতীয়
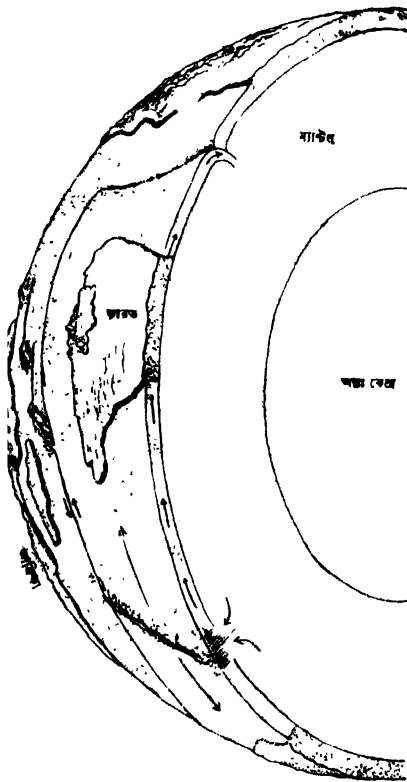
১'১ প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অন্তর্দৃশ্য। উপরের প্রবাহিত ত্বকে ভারত আফ্রিকা ইত্যাদি, তার নীচে ম্যান্টল এবং কেন্দ্রস্থলে লৌহ-নিকেল সমৃদ্ধ অন্তঃ কেন্দ্র।

আবহাওয়া। ৩৫০ কোটি বছর পুরোনো বেরাইট ($BaSO_4$) মণিকের মধ্যে প্রাপ্ত গ্যাস-জলের পদার্থের বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে কার্বন-ডায়কসাইড (CO_2), জল (H_2O), নাইট্রোজেন (N_2) এবং কার্বন মনোকসাইড (CO) ; এবং কম পরিমাণের অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2), মিথেন (CH_4) ও হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)।

প্রাচীন ধূম্রপুঞ্জে অবশ্য এই সব গ্যাসগুলি ছিল কিন্তু তাদের বহুগুণ বেশী ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম। সেই সময়কার হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের তুল্যমান বর্তমানে কোনো গ্রহে দেখা যায় না। আজ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়ন (গ্যাস) প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ জল আছে যার আণবিক ওজন ১৮ এবং নিয়নের চাইতে অনেক কম। কী করে তা সম্ভব হল ?

বায়ুমণ্ডলের এই প্রাথমিক অবস্থা পৃথিবীর জন্মের প্রথম ১০০ কোটি বছর ধরে চলতে থাকে। এই সময়কালে কিশোর সূর্য আজকের তুলনায় অনেক সক্রিয় হয়ে ওঠে। সূর্য এখন মাঝ-বয়সী যুবক। তার আয়ুষ্কাল মোটে হাজার কোটি বছর, অর্থাৎ আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর পর বৃদ্ধ-সূর্য হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে ফেটে ছোট নিউট্রন 'বামনে' (dwarf star) পরিণত হবে।

যাক সে ভবিতব্যের কথা। প্রায় সওয়া চারশ' কোটি বছর আগে উচ্ছল শিশু সূর্য থেকে এক প্রচণ্ড সৌর নিশ্বাসের মত প্রচণ্ড ঝটিকা (solar flare) এসে ঐ আদিম বায়ুমণ্ডলকে উড়িয়ে মহাশূন্যে বিলীন করে দেয়।

অক্সিজেনের বায়ুমণ্ডল কবে হল ?

প্রশ্ন জাগে, তবে এ নাইট্রোজেন (৭৭.১৬ শতাংশ), অক্সিজেন (২০.৬ শতাংশ) সম্বলিত জীবনদায়ক বায়ুমণ্ডল কীভাবে হল ? কবে হল ?

এতক্ষণে আমরা জেনেছি যে আদিম অবস্থায় বিজারক বায়ুমণ্ডল ছিল, যা অপসারিত হল সৌর ঝটিকায়।

ঐ সময়ে পৃথিবীর শৈশব অবস্থা এবং দেহে অস্থির চঞ্চলতা। ফলে কাঁচা এবং পাতলা ভূ-ত্বক ফেটে ভেতর থেকে গলিত কালো পাথর (বেসল্ট ইত্যাদি) যেমন বেরিয়ে আসতে লাগল তেমনি প্রবলবেগে উদ্গীর্ণ হল প্রচুর পরিমাণের গ্যাস পৃথিবীর উদর থেকে। এই গ্যাসই জমে শিশু-পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করল। ঐ গ্যাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন যেমন ছিল তেমনি ছিল বাষ্প বা জল।

ঐ সময়ে অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বর্তমানের জীবন রক্ষাকারী 'ওজোন' (O_3) স্তর ছিল না। এই স্তরটির প্রধান উপযোগিতা হল যে এটা সূর্য-নিঃসৃত অতিবেগুনী (ultraviolet) রশ্মি শুষে নিয়ে জীবজগৎকে তার রোষ তথা জীবনবিধ্বংসী ক্ষমতা থেকে রক্ষা করছে। আলোচ্য সময়ে ওজোন স্তর না থাকায় সূর্যের অতিবেগুনী (UV) রশ্মি সরাসরি বায়ুমণ্ডলের জলকণা (H_2O)-কে আলো বিশ্লেষণের (photo-dissociation)-এর মাধ্যমে হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন বা অম্লজান (O_2)-এ বিভাজিত করে। অতি হাল্কা হাইড্রোজেন ভৌমাকর্ষণকে উপেক্ষা করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায় এবং অক্সিজেন ধরা পড়ে থাকে। এভাবে ক্রমে বায়ু-মণ্ডলের অক্সিজেন জমে ওঠে যা আবার অতিবেগুনী সৌররশ্মির সংঘাতে ওজোনে ($O_2 + O \rightarrow O_3$) পরিবর্তিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে একটি স্তরের সৃষ্টি করে। এই ওজোন-স্তর সৃষ্টি করে এখনও মারাত্মক UV-বিকিরণ থেকে প্রাণীজগৎকে বাঁচিয়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পরবর্তীকালে ২৮০ কোটি বছর আগে জলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে এবং উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ (photo-dissociation)-এর ফলে বহুল পরিমাণ অক্সিজেন নিয়ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে তৈরি হওয়ায় বায়ুমণ্ডল এখনও বাসোপযোগী হয়ে আছে।

ওজোন স্তর সৃষ্টি হওয়ার পরই জন্ম নিল জীবন। জীবনের প্রাথমিক জীবকোষ 'ইউকেরিয়োটিক সেল' (Eukaryotic cell) প্রায় দুশ' কোটি বছর আগে হয়েছিল এমন ভাবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যাচ্ছে। এর আরও আলোচনা পরে করছি।

সমুদ্র জলের উৎপত্তি

এতক্ষণে ত বোঝা গেল যে বায়ুমণ্ডলটা আদিম পৃথিবীর উদরস্থ বায়বীয় পদার্থের উপাদানে তৈরি। তবে এত বিশাল বিশাল গভীর সমুদ্র যার গভীরতম স্থানে মাউণ্ট এভারেস্টকে নামিয়ে দিলে তারও উপরে দুই কিলোমিটার জল থাকবে—এমন পরিমাণ জল বা মেরু অঞ্চলের হিমবাহ, নদী বিধৃত এত জল কোথা থেকে এল ? এর উত্তরটা একই—পৃথিবীর পেট থেকে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অনেক গ্যাসের সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প নির্গত হয়ে আকাশে মিশে যায়। প্রাচীন পৃথিবীর জলীয় বাষ্প জমে জল হতে পারে ; কিন্তু জলীয় বাষ্প আসে কোত্থেকে ? এই জল এসেছে কতকগুলো জল বা হাইড্রোক্সিল-বাহী মণিক থেকে। পৃথিবীর এই মণিকগুলি—যেমন, মাইকা বা অভ্র (Mica), সার্পেন্টিন (Serpentine), এম্ফিবোল (amphibole), ইত্যাদি কোনো কারণে ২৩০° ডিগ্রী সেলসিয়ার্সের বেশী তপ্ত হলে এরা অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং জল নির্গত হয়। পৃথিবীর বিশাল জড়বস্তুর মধ্যে নিহিত জলের মোট পরিমাণ এতখানি যে মোটে ৩ মাইল গভীর জলের ক্ষীণ ত্বকের জলাশয় (যা ক্ষুদ্রকায় মানুষের চোখে বিশাল বলে প্রতীয়মান) সৃষ্ট করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সমগ্র বায়ু ও সমুদ্রের মোট জলের কয়েক হাজার গুণ জল পৃথিবীর এই ধরনের মণিকের মধ্যে কঠিন অবস্থায় বিধৃত হয়ে আছে। সুতরাং পৃথিবীর রাসায়নিক গঠনের সামান্য অংশ জল ; এবং সেই জলই পৃথিবীর ত্বকে ৭১ শতাংশ সমুদ্র করে ঢেকে রেখেছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট জলের ৯৮ শতাংশ সমুদ্র-বিধৃত, বাকী ২ শতাংশ ছড়িয়ে আছে হ্রদ, নদী, হিমবাহ, মেঘ ও ভূ-জলে।

প্রাচীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রজল বলতে গিয়ে স্বাভাবিক প্রসঙ্গেই জীবন-উদ্ভবের কারণ-সূত্রগুলি আরও বেশী আলোচনার দাবী রাখে।

জলে জীবনের সূচনা

ওজোন তৈরির আগের পৃথিবীর বিজারিত (anoxygenic) বায়ুমণ্ডলে যখন প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি

ছিল এবং প্রচুর নবীন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ঘন ঘন তেজদৃপ্ত অগ্ন্যুৎপাত ও বাষ্প উদ্গীরণ হচ্ছিল তখন আকাশে ঘটেছিল প্রবল বজ্র-বিদ্যুৎপাত এবং আকাশ থেকেও বাধাবিহীনভাবে নেমে আসত প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি। এই বিদ্যুৎ ও রশ্মির সংঘাতে সৃষ্ট হয়েছিল গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ ইত্যাদি শর্করা, অ্যামিনো এসিড, নাইট্রোজেন এবং কার্বন সম্বলিত অণু যার থেকে তৈরি হল জীবনের উপাদানগুলি, যথা—প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং শক্তিধারক এ-টি-পি (A T P-adenosine triphosphate) যৌগিক অণুসকল।

লেবরেটরীতে ঐ সব গ্যাসে তড়িৎ-বিচ্ছুরণের দ্বারা জীবনের মূল উপাদান অ্যামিনো এসিড তৈরি করা গিয়েছে। তড়িৎ ছাড়াও তাপ, বিটা কণিকার আঘাতে বা ২০০০ থেকে ২৫০০ এন্‌গস্ট্রমের অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করেও অ্যামিনো এসিড জাতীয় প্রাণের উপাদান সৃজন করা যায়।

তৎসত্ত্বেও ধারণা করা হয় যে প্রাণের সর্বপ্রথম সাড়া জেগেছিল কোনো এক দৈব ঘটনায় বা 'চান্স-ফ্যাক্টরে।' কিন্তু প্রায় ১০০ কোটি বছর লেগেছিল অজৈব ঐ যৌগিক পদার্থ থেকে প্রাণের 'জিন' (gene)-এর উদ্ভব হতে।

দ্রষ্টব্য ঃ বর্তমান সমুদ্রগুলির মধ্যে প্রধান হল প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর। নীচের ছকে তাদের বিস্তার, আয়তন (ঘনফল) ও গড় গভীরতা দেওয়া হল। এর সঙ্গে ভারতের চারপাশের সাগর ও উপসাগরের তথ্যও দেখানো আছে।

সমুদ্র	বিস্তার (লক্ষ বর্গ কি.মি.)	আয়তন (লক্ষ ঘন কি.মি.)	গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত	১৮১৩	৭১৪৪	৩৯৪০
আটলান্টিক	১০৬৬	৩৫০৯	৩২৯১
ভারত	৭৪১	২৮৪৬	৩৮৪০
মোট	৩৬২০	১৩৭৯৯	৩৭২৯
আরব সাগর	৩৮·৬৩	১০৫·৬১	২৭৩৪
বঙ্গোপসাগর	২১·৭২	৫৬·১৬	২৫৮৬
আন্দামান সাগর	৬·০২	৬·৬০	১০৯৬

আজকাল আবার বিশ্রুত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েল মনে করেন যে এই দৈব ঘটনা ঘটিয়েছিল একটা ধূমকেতু যা সৌরমণ্ডলের বহির্দেশ থেকে জীবনের বীজ এনে কোনো এক সময়ে পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। বৃষ্টিপাতে সে বীজ সমুদ্রে নেমে জীবের উদ্ভব ঘটায় এবং বিবর্তনের মহারথ ছুটতে শুরু করে। জীবনের উদ্ভব-স্থল ছিল মহাসমুদ্রের গভীর অন্ধকার তল অথবা সমুদ্র-লগ্ন হ্রদ বা 'লেগুন'।

এই প্রাচীন জীবনের রূপ-রেখা আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারিনি। এর কারণ প্রাচীন সমুদ্রের পলল জমা পাথরে ঐ জেলী-জাতীয় নরম প্রাণীর ছাপ সনাক্ত করা খুবই কঠিন। সব চাইতে পুরোনো যে জীবের অস্পষ্ট দাগ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গেছে তার বয়স ৩৫০ কোটি বছর। অর্থাৎ ঐ সময়ে প্রথম জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে বলে এখনও অনুমান করা হয়।

সাম্প্রতিক কালে আণ্টার্টিকার উত্তর উপকূলের সমুদ্রে যে সজীব বহুকোষী নীল-সবুজ এল্‌জি (Blue-green algae) পাওয়া গেছে, তাকে এক অন্যতম প্রাচীন জীবনের টিকে যাওয়া এক রূপ বলে মনে করা হচ্ছে। এরা প্রায় ১২০ কোটি বছর আগে উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গের নিচে নিয়ত তরঙ্গাঘাতপ্রাপ্ত অতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল।

'..... মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণে মাঝে ; লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী—'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের'—......

—রবীন্দ্রনাথ

প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন

এক স্থির পরিমাণ লাভ করে। এই সময়েই প্রোকেরিওটিক (Prokaryotic) জীবকোষ থেকে ইউকেরিওটের বিবর্তন ঘটে।

একবার সৃষ্ট হওয়ার পরে জীবনের রোমাঞ্চকর বিবর্তনের ইতিহাস শুরু হয় যার শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি ছিল বর্তমান যুগের মানুষ। আদিমযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ৫০ কোটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ আজ টিকে আছে। শুধু মানুষ নয়, বর্তমান জীবজগতের সমগ্র মানের পিছনে আছে কোটি কোটি জীবের সংহার ও বিলুপ্তির ইতিহাস। এই ধ্বংস শুধু প্রজাতিকেই নয়—গণ, গোত্র, বর্গ, এমন কি গোটা শ্রেণীকেই বিলোপ করেছিল।

এইভাবে বিলুপ্ত এক মাছের জীবন্ত সন্ধান আশ্চর্যভাবে পাওয়া গেল ১৯৩৮ সালে। কোলাকান্থ গণের মাছ লাটিমেরিয়া (latimeria) সাড়ে ছ কোটি বছর আগে ডাইনোসরের আমলে ধ্বংস পেয়েছিল বলে জানা ছিল কিন্তু ঐ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে একটি লাটিমেরিয়া ধরা পড়ে। ১½ মিটার (প্রায় ৫ ফুট) লম্বা ধূসর তৈলাক্ত এই চকচকে মাছ মাদাগাস্কারের কাছে ভারত মহাসাগরে বাস করছে। এর দুপাশে, তলে ও নিচে চারটে পাখনা ছাড়াও পিঠে আছে দুটো পাখনা—সবগুলিই মাংসল চামড়ায় ঢাকা। আমরা জানি চতুষ্পদী স্থলজীবের আবির্ভাব ঘটেছিল এমনই মাংসে ঢাকা চার পাখনার মাছ থেকে কয়েক সহস্র লক্ষ বছর আগে।

বায়ুমণ্ডলের বিবর্তন

আমরা এর আগে জেনেছি যে পৃথিবীর সৃষ্টির কিছুকাল পরে আদিমতম বায়ুমণ্ডল অপসারিত হয়ে নূতন বায়ুমণ্ডলের ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি শুরু হয়। এই অবস্থায় অতিবেগুনী রশ্মির সংঘাতে আলোক-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন গঠিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে জমতে লাগল এবং হাল্কা হাইড্রোজেন ও কিছু নোবল গ্যাস মহাশূন্যে বিলীন হল। ওজোন স্তরও পরে তৈরি হল এবং ৩৫০ কোটি বছর আগে জীবনের শুরু হল। উদ্ভিদের উদ্ভবের পর থেকেই সালোক-সংশ্লেষের ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

কিন্তু গত প্রায় ২৫০ কোটি বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ মোটামুটি এক রকমই থেকে গেছে যদিও মাঝে মাঝে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে বা কমেছে।

যখন বেড়েছে তখন বায়ুমণ্ডল কিছু রশ্মির বিকিরণের পক্ষে 'অস্বচ্ছ' হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে 'গ্রীন-হাউস এফেক্‌ট' সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলকে
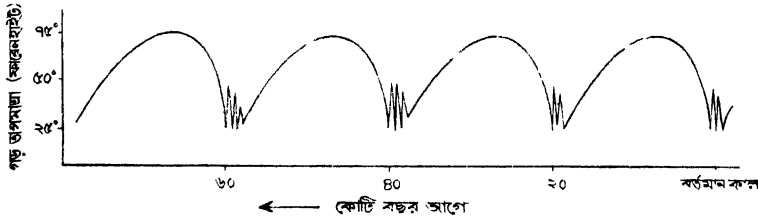
১'২ : ২০ কোটি বছরের ব্যবধানে তুষার যুগ।

উত্তপ্ত করে তুলেছে এবং মেরু প্রদেশের তুষার গলিয়ে সমুদ্রে স্ফীতি ঘটিয়েছে, এনেছে মহাপ্লাবন। এমন মহাপ্লাবন পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ কয়েকবার ঘটেছে।

এই ঘটনার মাঝে মাঝে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে কমে গিয়ে এনেছে তুষার যুগ। পাথরের জীবাশ্ম থেকে জানা যায় যে অতীত পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বর্তমান যুগের চাইতে অনেক বেশী ছিল। ২০ কোটি বছর অন্তর অন্তর তুষার যুগে পৃথিবী বরফাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে (চিত্র ১'২) এমনই তুষার যুগের (প্লায়স্টোসিন তুষার যুগের) শেষ পাদে মানুষের আবির্ভাব ঘটে—পর্বতগুহায় জীবনের বিবর্তনের এক চরম সন্ধিক্ষণে।

বর্তমান পৃথিবী গত তুষার যুগের শেষ প্রহর গুণছে এবং নানা কারণে (প্রধানতঃ মানুষের জ্বালানী দহনে ও বৃক্ষাদি সংহারে) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। মেরু তুষারের হচ্ছে সংকোচন। সমুদ্রজলের হচ্ছে স্ফীতি।

গত ১০০ বছরের সমুদ্র-পৃষ্ঠের পরিমাপ দেখে আগামী মহাপ্লাবনের আগমনের ইংগিত নিরূপণ করা হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হয়েছে ১২ সেন্টিমিটার গত এক শ' বছরে। এই স্ফীতির হার যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে

ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পৃথ্বীব্যাপী যন্ত্রের উত্তাপে ও গ্যাসে ক্রম-তপ্ত বায়ুমণ্ডল মেরু অঞ্চলে বরফের আয়তন সংকীর্ণতর করে তুলেছে! বরফগলা জলে সমুদ্র স্ফীত হয়ে তটরেখা লঙ্ঘন করে মহাদেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। স্থলভাগের ক্রমাবনতির মহাদুর্যোগ কোনো মানব-দুর্বুদ্ধিতে ঘটে যেতে পারে এই আণবিক যুগে। কোনো বোমার আঘাতে বা কোনো 'চেইন' (chain) প্রক্রিয়ায় যদি উত্তর মেরু ও আনটার্কটিকার বরফ গলে যায় তবে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার উঁচু হয়ে উঠবে এবং পৃথিবীর উপকূলের প্রায় সব বড় বড় বন্দর ও শহর জলের নীচে তলিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করা হয়েছে।

বর্তমান বায়ুমণ্ডলের রূপ

চিরচঞ্চলা মায়াবী বায়ুমণ্ডলের স্নেহচ্ছায়ায় পরিবৃতা আমাদের গ্রহটি। বায়ুমণ্ডলের এই ঢাকনার উচ্চতা প্রায় ৩২৫ কিলোমিটার। এই আবরণে আটকা পড়ে মহাজাগতিক রশ্মি; উল্কারা নেমে আসার পথে এর বাধা-জনিত প্রবল সংঘর্ষে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে কস্‌মিক ডাস্ট্‌ হিসেবে। এর প্রধান চার স্তরের রূপ বর্ণনা করা হল:

[এক] **ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)**: ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন ১০-১২ কি.মি.-ব্যাপী সর্বাপেক্ষা ঘন ও ভারী স্তর। এই স্তরের পক্ষপুটে ঘটছে জীবের জন্ম, প্রতিপালন, যোগ্যতমের ধারণ ও অক্ষমের লয়। এই আশ্রয়েই আমাদের চিরপরিচিত—

'গাংচিল-ডাক-চেরা ঝিলমিল আকাশ
লাল নীল সাদা কালো ভোল পালটিয়ে
হয়ে রয় স্বপ্নের আভাস; কারুকার্যে তার
খোদিয়া অংকিত থাকে জীবন স্পন্দন
চিক্কণ চিৎকার আর সুক্ষ্ম আবেদন।

(—'বেত্রবতী')

এ মণ্ডল নীচে ভারী ও উপরে হাল্কা। এতে জীবনধারণের অম্লজান, যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) ইত্যাদি ছাড়াও আছে ধূলিকণা, অঙ্গারাম্লজান

ও জলীয় বাষ্প। এতেই নিহিত থাকে বিধ্বংসী ঝড়, মুষলধারা ও বজ্রপাতের উপাদান। বর্তমান শিল্প-সভ্যতার ভারে এখানে—

'চিল-কাক-ডাক মুছে গেলে পর
চিমনির ধোঁয়া মাখা আকাশ চুঁয়ে
নেমে আসে নূতন আঁধার
বিস্রস্ত চুলের আবরণে।'

(—'বেত্রবতী')

[দুই] **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) :** ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের এই স্তরের বাতাস খুবই হাল্কা, অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যল্প এবং তাপমাত্রা প্রায়—৫৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

[তিন] **ওজোনোস্ফিরার (Ozonosphere) :** এই স্তরে ওজোনের পরিমাণ খুব বেশী এবং পার্থিব শব্দতরঙ্গ এখানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

[চার] **আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) :** এই স্তর তড়িৎবাহী ছোট কণায় (বা 'আয়ন-এ) ভর্তি। হাইড্রোজেন, হিলিয়ম ও ওজোন গ্যাসগুলি এখানে আয়নিত অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত হাল্কা এই স্তর বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে, তার ফলে রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত সকল সংবাদ ও অনুষ্ঠান বহুদূরে পৌছানো সম্ভব হয়। মেরু অঞ্চলে যে উজ্জ্বল মেরুজ্যোতি (aurora) দেখা যায় তার সৃষ্টি হয় এই স্তরে।

বায়ুমণ্ডলের আবর্ত :

নিয়ত সঞ্চরণশীল বায়ুমণ্ডলে কোথাও কোথাও সংঘটিত হয় ঘূর্ণীঝড়, যার স্থান-ভেদে নাম হয় সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন, উইলি ইত্যাদি। এরা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ৪০ ডিগ্রী উত্তর এবং দক্ষিণে সীমাবদ্ধ (চিত্র নং ১'৩)। এই অঞ্চলে বায়ু-চাঞ্চল্য-জনিত আবর্তের ব্যাস এক থেকে তিন হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। খুব জোরালো হলে এদের

উর্ধ্ব-ব্যাপ্তি ২০-২৫ কিমি পর্যন্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ঝড়ের গতি থাকে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ৪০০ কিমি।

এই হাওয়াবর্তগুলির পরিসীমার ধ্বংসের রূপ কেন্দ্রাঞ্চলের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। উত্তর গোলার্ধে এরা দক্ষিণাবর্ত হয়, দক্ষিণ গোলার্ধে এরা চলে বামাবর্ত হয়ে। ভারতে ও আশেপাশের অঞ্চলে সাইক্লোনের ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপ দেখা যায় প্রায়শঃই।
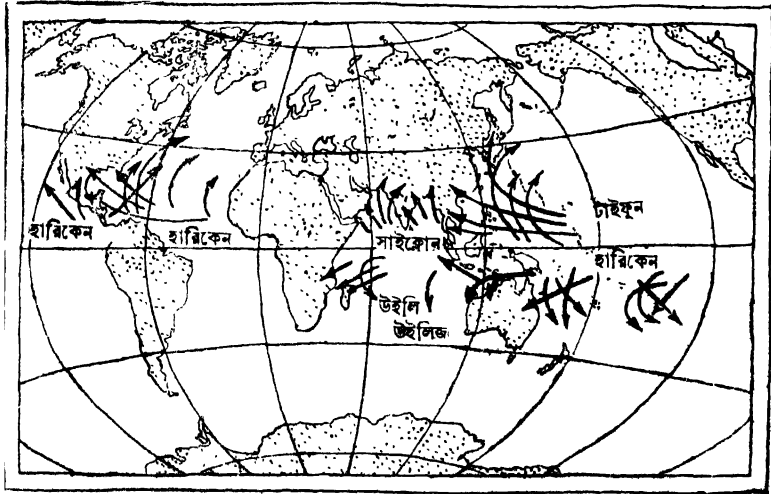
১·৩ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ৪০° ডিগ্রী উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চলে ঘূর্ণীঝড়ের স্থানীয় নাম ও আবর্তনের দিক।

আমাদের কাছে পরিচিত সাইক্লোনের ভিন্-দেশে ভিন্-নাম যেমন ; উঃ প্রশান্ত মহাসাগরে—টাইফুন, উঃ আটলান্টিকে—হারিকেন, অস্ট্রেলিয়ায়—উইলি-উইলি (চিত্র নং ১·৩)। এদের সংঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সব অঞ্চলে এক ভয়াবহ বিধ্বস্ততা ও হাহাকারের রূপ আঁকা পড়ে যায়। অনেক সময় এদের সাথে নেমে আসে প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যাকীর্ণ বর্ষণ-জনিত প্লাবন ; সেই সঙ্গে আবার এদের আবর্তে সমুদ্রজল আলোড়িত হয়ে ফুলে-ফুঁসে গর্জন করে ছুটে আসে তটসীমা ভেঙ্গে দেশের উপকূলবর্তী

অঞ্চলে এক হঠাৎ-প্লাবনের ভয়ঙ্কর ইতিহাস নিয়ে। এই উত্তাল সমুদ্রের রূপ হয় যেন—

'হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে-ত্রাসে উর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জনে
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল।'

—রবীন্দ্রনাথ।

যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাইক্লোন ও সমুদ্র ঢেউ বা সুনামী যে ধ্বংস-লীলার সৃষ্টি করেছে তার কিছু হিসাব অনেক আবহাওয়া-দপ্তরে নথীভূক্ত আছে। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এদের আগমনী ইংগিত ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে গবেষণা-জাহাজ ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করছে, বিশেষতঃ MONEX (মনসুন্ এক্স্‌পেরিমেণ্ট)-জাতীয় প্রকল্পের সাহায্যে।

জলচক্র-ক্রম

আমরা জানি সমুদ্রের জল সৌরশক্তি আহরণ করে বাষ্পীভূত হয়ে পর্বতশিখরে বা মেরুপ্রদেশে বরফে ঘনীভূত হয় এবং ক্রমে গলে বা বৃষ্টির ধারা হয়ে নদী-নালার মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই জল চক্রক্রম চলছে পৃথিবীপৃষ্ঠে সমুদ্র সৃষ্টি হওয়ার শুরু থেকে।

এই জলের কিছুটা মাটির মধ্যে চুঁয়ে ভূ-গর্ভ জল হয়ে নীচে প্রবাহিত হয়। কখনও কোথাও ভূ-তাপে উষ্ণ হয়ে উষ্ণ-প্রস্রবণ হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। আবার সৌর তাপোষ্ণ সমুদ্র জলের গভীরে শীতল জলপ্রবাহও দেখা যায়।

ঐ ধরনের সমুদ্রতলস্থ শীতল জল সমুদ্র হতে বাষ্প হয়ে উঠে তুষার হয়ে জমে, আবার গলে সমুদ্রের গভীরে মিলিত হতে মোট সময় লাগে প্রায় ৪০,০০০ বছর। অর্থাৎ যে জলকণা আজ প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গভীরে আছে তা বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ ও স্থল-বিচরণ করে আবার

সমুদ্র গভীরে পৌঁছতে চল্লিশ হাজার বছর লাগবে। জল চক্র-ক্রমের সময়কাল ও পরিমাণের এক রূপ দেওয়া হয়েছে ১'৪ নং চিত্রে।

১'৪ : স্থল, বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রে জলের বিবর্তন।
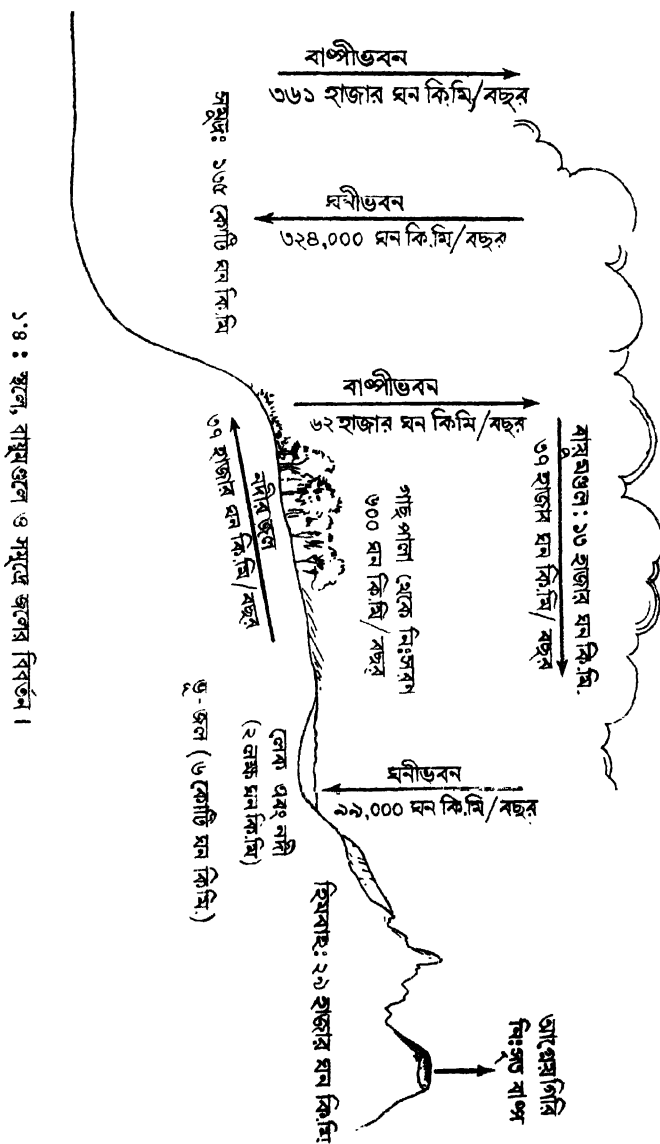
এ প্রসঙ্গে জলের একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে জলে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ছাড়াও অতি সামান্য পরিমাণ ওর অন্য আইসোটোপ, যথা— ডয়টেরিয়াম (D_2) ও ট্রিশিয়াম (T) আছে। ট্রিশিয়ামেরও উৎপত্তি হয় অতিবেগুনী রশ্মির সংঘাতে। কোনো ভূগর্ভস্থ জলে এই ট্রিশিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা যায় যে ঐ জল কতকাল বায়ুমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে বাস করছে।

এই গবেষণা করে আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী (PRL)-এর বিশেষজ্ঞরা রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কয়েকটি কূপের জলের বয়স বের করেছেন-প্রায় দু' হাজার বছর।

বেশী পুরোনো জল থাকা মানে ওখানে নূতন জলের সঞ্চারণ নেই অর্থাৎ ঐ জল ফুরোলে আর নূতন জল পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া কৃত্রিমভাবে কোনো জায়গার ভূ-গর্ভস্থ জলে ট্রিশিয়ামের সংযোজন করে পরে অন্যত্র ভূ-জলে ঐ ট্রিশিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করে ঐ জলের গতিবিধির দিক ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ জলের সমীক্ষা করা হয় বা পানীয় জলের সন্ধান করা হয়।

সাহারা মরুভূমির ভূ-অভ্যন্তরস্থ জলের নিশানা অনুসন্ধানের সাথে ঐ জলের বয়স নির্ধারণ করাও হচ্ছে। ১৯৭২ থেকে '৭৩ সালে সাহারার ফেজাল প্রদেশের মুরমুগ এবং উবারি মরুভূমির নিচের জলে কার্বন -১৪ ও -১৩, ট্রিশিয়াম, ডয়টরিয়াম এবং অক্সিজেন -১৮-এর পরিমাণ জানা হয় ঐ বয়স ও জলের প্রবাহ দিক নির্ণয়ের জন্যে। প্রতি নমুনায় প্রায় ৬০ লিটার জল লাগে।

দ্বিতীয় পর্ব

সমুদ্রের গ্রাস

সূচনা

'মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁষিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
……ক্ষুব্ধ লুব্ধ হিংস্র বারি রাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্তপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।"

—**রবীন্দ্রনাথ**

যুগে যুগে পৃথিবীর বহু অংশকে সমুদ্র গ্রাস করেছে। আগ্রাসী সমুদ্রের অভিযানের যুগে আমরা বাস করছি। প্লিস্টোসিনের তুষার যুগের শেষ পাদে সারা পৃথিবীর হিমবাহগুলি গলে ছোট হয়ে আসছে এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের হচ্ছে ক্রমস্ফীতি। এই সমুদ্রের প্রসারের গতি অবশ্য খুবই ধীর, তবুও একটা মানুষের জীবনে তা নজরে আসা সম্ভব।

এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে একক বা নূতন নয়। ভূ-ইতিহাসে দেখা যায়, উত্তর আমেরিকার বিশাল স্থলভূমি সমুদ্র বহুবার গ্রাস করেছে আবার ছেড়ে চলে গেছে বহুবার বিজিত সাম্রাজ্যে নিজস্ব ইতিহাস পলি-পড়া প্রস্তরের গায়ে নিখুঁতভাবে লিখে রেখে। আমেরিকা ছাড়াও বহু অঞ্চলে সমুদ্রের এই স্থলভাগ-বিজয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিকবার।

বর্তমান সভ্য পৃথিবী আবার এই সমুদ্রের আক্রমণের কবলে। সমুদ্র-গুলি আজ অনেকক্ষেত্রেই তটসীমা ছেড়ে এগিয়ে আসছে দেশের মধ্যে।

এখনই মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত অগভীর সাগরগুলি ভর্তি হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। আজকের বেরেন্ট, বেরিং ও চীন সাগর এইভাবেই জলপূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া এখানে-সেখানে দেশের মধ্যস্থিত সাগর, যথা— হুডসন উপসাগর, সেন্ট লরেন্স, বাল্টিক ও সুন্দা সাগরেও সমুদ্রের লোনা জল এগিয়ে এসেছে এবং আটলান্টিকের উপকূলের বহু নদীর মোহানা
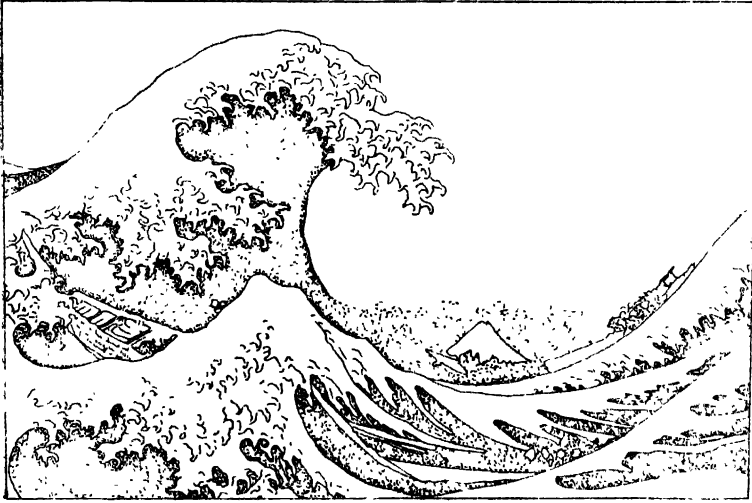
২.১ : প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী হোকুসাই অংকিত ভয়ংকরী আগ্রাসী তরঙ্গ মালা 'সুনামি'র এক প্রসিদ্ধ চিত্র।

অঞ্চল আজ গভীর সমুদ্রের নীচে। বর্তমান হুডসন নদী ও সাসকুইহানা নদীর মোহানা অঞ্চল কয়েক শ' বছর আগেও বর্তমান সমুদ্রের মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতীতকালের অনেক খাল ও তটভূমি আছে কেসাপিক ও দেলাওর উপসাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের নীচে সমাধিস্থ। কোথায় এবং কখন এই তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস শান্ত হবে বলা কঠিন।

তুষার গলা জল

গত তুষার যুগের বরফ মানব-সভ্যতার শুরু থেকেই গলতে শুরু করেছিল, এখনও গলছে এবং আরও বহু কাল ধরে গলবে। হিমালয়ের হিমবাহ-গলা জলে শত শত নদীর পুষ্টি, সে নদীর জলে সমুদ্রের পুষ্টি কিন্তু

পুষ্টির তুলনায় বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হওয়ায় সমুদ্রের ক্ষতি বহু গুণ কম। বাষ্পের জল আবার জমে সমুদ্রের বুকে—নদী-নালা বেয়ে পৃথিবী ধোয়া জল আবার তারই কাছে ফিরে আসে। হিমালয়, আল্পস, আন্দিজে এই ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে পৃথিবীর হাজার হাজার হিমশৈল থেকে। উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার গলছে, সাইবেরিয়ার বরফ গলছে, ক্যানাডায় থ' (thaw) হচ্ছে। মোট ফল, সমুদ্রের হচ্ছে স্ফীতি। তার পরিধির মধ্যে জল সঙ্কুলান হচ্ছে না। আজ যদিও কোনও রকমে এঁটে যায় আগামী-কাল আর আঁটবে না। পৃথিবীর আবহাওয়া গত প্লাইস্টোসিন তুষার যুগের শীতলতা থেকে শেষ প্রহরে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে চলেছে। বরফ তাই গলছে। যত গলছে, তত জমছে না। তাই জল বেড়েই চলেছে।

আবহাওয়ার উষ্ণতায় জলস্ফীতি

পারমাণবিক বিস্ফোরণে ও প্রাকৃতিক নানা কারণে আবহাওয়া আরও পরিবর্তিত হয়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে। রাশিয়া আজ বরফ গলিয়ে জমি তৈরি করছে। সাইবেরিয়ার জমাটবাঁধা তুষার তাদের বিজ্ঞানের কুঠারের আঘাতে ছিন্নমূল হয়ে নেমে পড়েছে সাগরে সাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর, বাল্টিক, আর্কটিকে হিমবাহ গলে উপকূল ছাপিয়ে জল এগিয়ে আসছে অন্য দেশের উপর। রুশ-বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে সেখানকার মেরুতুষার অন্য দেশের উপকূলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এমন ঘটনা যে পৃথিবীতে বহু বার ঘটেছে, তা আগেই বলা হয়েছে; এই ঘটনা আবার ঘটছে, তাই আমাদের সভ্যতার আশঙ্কা। আশঙ্কা বিশেষতঃ উপকূলবর্তী দ্বীপবাসীদের, যারা নীল জলের তাড়া খেয়ে পাহাড়ে চড়তে জায়গা পাবে না। নীল মৃত্যু 'সুনামি' (Tsunamis) এক বিধ্বংসী তরঙ্গ প্লাবন যা কয়েক ঘণ্টায় ৮০-১০০ ফুট উঁচু হয়ে দেশে প্রবেশ করে ধ্বংস ও হাহাকারের চূড়ান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে যায় তাই সেই সুনামির দেশ—জাপানের তাই ভয় (চিত্র ২.১)। সুমাত্রা, বোর্নিও ও অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই ভয়।

বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও কিছু বৃদ্ধি পেলেই যা তুষার গলবে,

তাতে প্রশান্ত মহাসাগরের জল ১০০ ফুট উঁচু হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল। সেই তাপমাত্রায় বর্তমান আটলান্টিকের তীরের সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র, নগর, শহর সব কিছু সমুদ্রের নীচে বিলীন হয়ে যাবে। সে সমুদ্রের জল এসে আপালেসিয়ান পর্বতমালার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে—আছাড়-খাওয়া জলের ফেনায় আপালেসিয়ানের চারদিক সাদা হয়ে যাবে, আর মেক্সিকো উপসাগর ও মিসিসিপি নদীর পার্শ্ববর্তী নিচু অঞ্চল জলের নীচে প্রহর গুণবে।

বরফ যদি আরও বেশী গলে?—তারও সম্ভাবনা আছে তা হলে? সমুদ্রের জল উঁচু হবে ৬০০ ফুট কি আরও অনেক বেশী—আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল মানব-সভ্যতার ইট-কাঠ-ঐতিহ্য নিয়ে অগাধ জলের নীচে নেমে যাবে ফসিল হয়ে থাকবার জন্যে। উত্তুঙ্গ আপালেসিয়ান অসীম সমুদ্রের মাঝে পর্বতসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হবে। আর্কটিক সমুদ্র ও হুডসনের জল এসে ক্যানাডাকে আবৃত করবে। আর মধ্য-ইউরোপ, আরব, পারস্য, ভারত, চীন ও সোভিয়েটের বিরাট অঞ্চল জুড়ে আর্কটিক, আটল্যান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংঘাত চলবে—আর সে সংঘাতে সৃষ্ট ঢেউ সাদা ফেনা হয়ে ছিটিয়ে পড়বে আল্‌প্‌স ও হিমালয়ের বিস্তৃত পর্বতের গায়ে।

আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর এই জলপূর্ণ রূপ আমাদের কাছে অচিন্তনীয়, জ্ঞানের বাইরে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে এমন ঘটনা বহু বার ঘটেছে, তার পরে ওলট-পালট হয়ে গেছে পৃথিবীর রূপ, স্থলভাগের পরিধি ও বিস্তার। এই পরিবর্তন এখনও চলছে।

স্থলের অবলুপ্তি

অ্যাটলান্টিকের তলদেশ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে বারমুডা দ্বীপ, উঠেছিল চিররুক্ষ এসসেনস দ্বীপ। ১৮৩০ সালে এক অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সিসিলি ও আফ্রিকার মাঝখানে ভূমধ্যসাগরে এক দ্বীপ হঠাৎ জেগে ওঠে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু-শ' ফুট উঁচু মাথা তুলে। তার পরে কয়েক বছরে সে দ্বীপটি অগাধ জলের নীচে নেমে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে দু-হাজার মাইল পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে চিরপরিচিত ফালকান দ্বীপ ১৯১৩ সালে ডুবে হারিয়ে যায় অতল সমুদ্রের তলায়। ১৯৪৯ সালে কয়েক দিনের জন্যে পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়ে জলের নীচে।

১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রাকাতোয়া কয়দিনের অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট গভীরে নেমে যায়। সে দিনটি ছিল মানুষের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর আতঙ্কের দিন। আতঙ্ক ছিল বিস্ময়কর ক্রাকাতোয়ার জ্বলে ফেটে চৌচির হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবার কাহিনীর মধ্যে। আতঙ্ক জেগেছিল যখন ক্রাকোতোয়ার দ্বারা আক্রান্ত সমুদ্রজল তপ্ত হয়ে শত ফুট উঁচু ঢেউয়ের মত ফণা তুলে সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের শত শত গ্রামের উপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল ধ্বংসের প্লাবন ডেকে। কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছিল একদিনে এই সুনামি—জাপানী অর্থ যার 'নীল মৃত্যু' (চিত্র ২'১)।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ ছাড়াও বরফগলা জলের তরঙ্গ পৃথিবীকে আক্রমণ করে কবলিত করেছে। সবচেয়ে বড় প্লাবন ঘটেছিল ১০ কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগে। তখন সমুদ্রজল উত্তর আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে এবং ঐ অঞ্চল জুড়ে এক আন্তর্দেশীয় সমুদ্র ছিল, যা চওড়ায় ১০০০ মাইল আর আর্কটিক থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর ক্রমে পূর্ব-দিকের মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিউ জারসি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সমুদ্র। জল বাড়তে বাড়তে বর্তমান উত্তর আমেরিকার অর্ধেকের বেশীই এই সমুদ্রের অধিকারে চলে গেল।

মহাপ্লাবনের ইতিহাস

এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী প্লাবন ঘটে এবং বর্তমান বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জলের নীচে লোপ পায়। শুধুমাত্র কয়েকটি উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর ছাড়া দক্ষিণ

ইউরোপের কোনও স্থলভাগ সে সময়ে জলের উপরে দেখা যেত না। এই সমুদ্র আফ্রিকায় প্রবেশ করে বালুকার পলিমাটি ফেলে। এই বালুকা বিধৃত অঞ্চলেই পরে সৃষ্টি হয় উষর মরু প্রান্তর সাহারার। সুইডেন, রাশিয়া, সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ভারতের কিছু অংশ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এই সমুদ্রের কবলে পড়ে যায়। আর এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার সুউচ্চ আন্দিজ পর্বত তখন সবেমাত্র জন্মলাভ করে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

ঠিক এই রকমের বিস্তৃত প্লাবন ঘটেছিল আরও আগে ডেভোনিয়ান, সিলুরিয়ান ও অর্ডোভিসিয়ান (৪০ কোটি বছর আগেকার) যুগে। বিভিন্ন যুগে বিচিত্র জল ও স্থলবিন্যাসের মাঝে হয়েছিল এই জলপ্লাবন। সেই সকল প্লাবনের ধারণা পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের কাহিনী থেকে পাওয়া যাবে।

হিমালয়ের ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় সামুদ্রিক চুনাপাথর এবং জীবাশ্ম এক অতীত সমুদ্রের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে। এই সমুদ্রের জল ছিল উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত ছিল এই টেথিস সমুদ্রের বিস্তার। ৫ কোটি বছরের স্বাক্ষরিত ইতিহাস বহন করে নুমুলাইট—যার দেহাস্থিতে গঠিত পাথর হিমালয়ে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যায়। মিশরীয়েরা এই পাথর কেটে স্ফিংক্স তৈরি করেছিল, পিরামিডের ইমারত তুলেছিল।

ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে শুরু করে ডেনমার্ক, জার্মানী হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত সমুদ্রজাত চুনাপাথর বিস্তৃত। এই চুনাপাথর পূর্বোল্লিখিত ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের সময় পলি থেকে সৃষ্ট হয়েছিল।

আচমকা ঝাঁপ-দিয়ে-পড়া নির্ঝর নায়াগ্রার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সিলুরিয়ান যুগে (অর্থাৎ প্রায় ৩৩ কোটি বছর আগে)। উত্তর থেকে আর্কটিক সাগর চুপিসারে দক্ষিণের দেশ দেখবার জন্যে চলে এসেছিল ঐ সময়ে। তার তীর ছিল নীচু আর জল ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ, ফলে খুব কম কাদামাটিই দেশের মধ্যে বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছিল। শুধু

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটে গঠিত ডলোমাইট পাথর সৃষ্টি হলো এর জলের নুন জমে এবং বর্তমান ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ধার দিয়ে খাড়াই সৃষ্টি করলো। তার পরে কেটে গেছে লক্ষ লক্ষ বছর। দক্ষিণ দেশ দেখে আর্কটিক আবার উত্তরে ফিরে গেছে। এই খাড়াইয়ের উপর দিয়ে বরফ গলা জল ঝাঁপ দিয়ে পড়তে শুরু করলো সুদীর্ঘকাল ধরে। কঠিন ডলোমাইটের নিচে নরম প্রস্তরীভূত কাদামাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলল ভূ-অভ্যন্তরে, উপরে ডলোমাইটের এক আবরণত্বক রেখে। তার পরে এক সময় ধ্বসে পড়লো উপরের ডলোমাইটের ছাদ নিচের গহ্বরে। তার ফলে বরফগলা জলের স্রোতপথে এক গভীর খাদের সৃষ্টি হলো। গড়িয়ে চলা নদী এই খাদে ঝাপ দিয়ে এগিয়ে চললো। সৃষ্টি হল এক জলপ্রপাতের। পৃথিবীতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করলো এই সুউচ্চ নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের সময় সমুদ্র-স্রোতও পরিবর্তিত হয় এবং এমন প্রমাণ আছে যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপ এই সমুদ্র-স্রোতই উত্তরে বয়ে নিয়ে গিয়ে আবহাওয়া উষ্ণ করে তুলেছিল, বরফ গলিয়ে মাটি বের করেছিল। ক্রিটেশাস যুগে দারুচিনি, লরেল গুল্ম, ডুমুর ইত্যাদি গাছ প্রচুর পরিমাণে গ্রীনল্যাণ্ডে জন্মায়; তাদের জীবাশ্ম থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের অতীত উষ্ণ আবহাওয়া সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

ইতিহাসের ধারা

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়গুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি উঁচু, দেশের ক্ষয় বেশী এবং সমুদ্রগুলি নিজেদের নীচু স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি সবচেয়ে নীচু এবং সমুদ্র তটভূমির সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের গ্রাস করছে। তৃতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্রের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা উঁচু করে তোলে।

পৃথিবীর সমুদ্রের এই সীমালঙ্ঘন ও স্থল জয়ের ইতিহাস খুঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী সুকার্ট একদিন এই বিংশ শতাব্দীর

পৃথিবীর মানুষকে জানালেন—আমরা এখন নূতন পর্যায়ের শুরুতে বাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলি এখন অতীতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু এবং সর্বাপেক্ষা মনোরম। কিন্তু নূতন পর্যায়ের সমুদ্রগ্রাস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকায়।

নীল সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ ছুটে আসছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। পৃথিবীর সমুদ্র আজ বুঝি ফুলে-ফুঁসে উঠছে একটু একটু করে বছরের পর বছর। এই তরঙ্গ যখন আরও উঁচু হবে? পৃথিবীর পুরানো ইতিহাসের পাতা আবার উল্টে এগিয়ে আসবে—পুনরাবৃত্তি ঘটবে ঘটনার? সভ্য মানুষ কোন্ অস্ত্রবলে সেই তরঙ্গ রুখবে?

সমুদ্র-পললে জীবাশ্ম ঃ জীব-বিবর্তনের কাহিনী

পাললিক প্রস্তরের গায়ে জীবাশ্মই জীবনের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে জানা যায় যে ৫০-৬০ কোটি বছর আগে কেম্ব্রিয়ান যুগে প্রথম শক্ত আবরণীর জীবের আবির্ভাব ঘটে। তার আগে ছিল নরম শরীরের 'জেলী ফিস্'-এর মত জীব যাদের ছাপ জীবাশ্ম হিসাবে খুব কম পাওয়া যায়। জেলী ফিসের (যাদের কেবলমাত্র মুখ ও পাকস্থলী ছিল) সাথে চ্যাপ্টা কৃমি, অঙ্গুরীমাল প্রাণী (যাদের স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক ছিল), নরম প্রবাল এবং আরও তুই ধরনের ঘুড়ির আকৃতির প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল (চিত্র নং ২.৩)।

এই কেম্ব্রিয়ান যুগেই শুরু হল হাজার রকমের বহুবিধ সামুদ্রিক জীবজন্তুর আবির্ভাব। কিন্তু এদের কারুরই ছিল না মেরুদণ্ড। এই সময়ে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর আবির্ভাব শুধুমাত্র সমুদ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, স্থলে কোনো প্রাণীর লেশমাত্র ছিল না। সমুদ্রের যতটুকু অংশে সূর্যের আলো প্রবেশ করত সেখানেই ছিল জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য। অনেকের শরীর ছিল শক্ত খোলস, পুরু চামড়া বা প্লেটে ঢাকা। আর ছিল শামুক জাতীয় জীব, গ্র্যাপ্টোলাইট্ (যাদের গাছের ডালপালার মত আকৃতি) ইত্যাদি। এদের মধ্যে সন্ধিপদ (arthropod) প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল যথেষ্ট। এই গোষ্ঠীতেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই কাঁকড়া, চিংড়ী, মাকড়সা, আরশুলা এবং অনেক পোকা-মাকড় ইত্যাদি। কিন্তু

এদের মধ্যে যে বহু-পদবিশিষ্ট ৩-১৮ ইঞ্চি লম্বা সামুদ্রিক জীব সব চাইতে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের নাম ট্রইলোবাইট্ (Trilobite)। জীবাশ্মের মধ্যে এদের পরিমাণ খুবই বেশী। এরা পৃথিবীতে ৩৭ কোটি বছর ধরে বেঁচেছিল।

জীব বিবর্তনের ঘটনাপঞ্জী চিত্রযুক্ত-ছকে দেওয়া হল

যুগ	জীব-রূপের ধারা
প্লাইস্টোসিন	
টারশিয়ারী	মানুষের আবির্ভাব; স্তন্যপায়ীর ও বর্তমান সামুদ্রিক জন্তুর বিকাশ
ক্রিটেশিয়াস	
জুরাসিক	সরীসৃপ (ডাইনোসর প্রধান)- এর রাজত্ব; উন্নত শ্রেণীর সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী
ট্রাইয়াসিক	
পারমিয়ান	
কার্বনিফেরাস	প্রথম সরীসৃপ
ডেভোনিয়ান	প্রথম মেরুদণ্ডী উভচর
সিলুরিয়ান	
অর্ডোভিশিয়ান	প্রথম মেরুদণ্ডী মাছ
কেম্ব্রিয়ান	আদিম অমেরুদণ্ডীর জীবাশ্ম
প্রাক্ কেম্ব্রিয়ান	

২'২ : জীববিবর্তনের ঘটনাপঞ্জী (নীচ থেকে উপরে)।

এর পরের যুগের নাম অর্ডোভিসিয়ন (Ordovician)—৪২ থেকে ৫০ কোটি বছর আগেকার যুগ। ঐ সময় নটিলয়েড (Nautiloid)

গোষ্ঠীর প্রায় ১৬ ফুট লম্বা শম্বুক জীবেরা সমুদ্রতলে রাজত্ব করত। তারামাছ ও শক্ত শরীরের প্রবালের আবির্ভাব এ সময়ে ঘটে। কিন্তু মাছ তখনও জন্মায় নি।

মেরুদণ্ডী মাছের প্রথম জন্ম হল ৪০ থেকে ৪২ কোটি বছর আগে সিলুরিয়ান (Silurian) যুগে। এই সময়ে সমুদ্র থেকে উদ্ভিদ্ মহাদেশে বিস্তারলাভ করে। এই সময়টাই ছিল পৃথিবী-পৃষ্ঠের মহাবিবর্তনের যুগ। উঁচু উঁচু ভাঁজ পর্বতশ্রেণী সৃষ্ট হতে লাগল নীচু জিওসিনক্লাইনের পলল চাপে উঁচু হয়ে। সমুদ্র সরে যেতে লাগল বিভিন্ন স্থানে মহাদেশের অভ্যুত্থানে। এরই শেষ অধ্যায়ে সামুদ্রিক বিছা বেয়ে উঠল সমুদ্রতটে এবং স্থলচর প্রাণী হিসেবে টিকে গেল।

এর পরে এল ডেভোনিয়ান (Devonian) যুগ—৩৫ থেকে ৪০ কোটি বছর আগে। সমুদ্র রূপ নিল প্রায় বর্তমান সমুদ্রগুলির মত। মাছ বিবর্তনে নানারকমের রূপ পেল বর্তমান যুগের মাছের মতই। বুদ্ধি, শক্তি এবং সঞ্চরণশীলতায় সমুদ্রের মধ্যে এদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেরুদণ্ডী মাছেরই কিছু ডাঙ্গার ধারে এসে ক্রমে স্থলে আশ্রয় নেয়। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এই মেরুদণ্ডী মাছের নানা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আজ মেরুদণ্ডী মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে। (চিত্র ২·২)।

পৃথিবী কোনো কালেই সুস্থির এবং স্থবির ছিল না। ২৫ কোটি বছর আগে পারমিয়ান (Permian) যুগে পৃথিবী-পৃষ্ঠ ব্যাপী আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে অগ্ন্যুদগার শুরু হয়। এ সময়েই একদিকে যেমন অ্যাপালো-সিয়ান পর্বতমালার জন্ম হল উত্তর আমেরিকায় তেমনি আবার গভীর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে গেল ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও দঃ আমেরিকা।

৩০ কোটি বছর আগে কার্বনিফেরাস (Carboniferous) যুগের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বিশাল বিশাল জঙ্গল বিস্তার লাভ করেছিল। তাদের বর্তমান পরিণতি দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী ঐ যুগের কয়লাবাহী স্তরে। রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, করবার মতই সারা পৃথিবীতে ঐ কার্বনিফেরাস যুগের মহীরুহের রূপান্তরিত রূপ কয়লা রূপে মানব-সভ্যতার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

উদ্ভিদ্ ছাড়াও জীবজন্তুরাও জল ছেড়ে মহাদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল বিবর্তনের নানা শাখা-প্রশাখায়। পারমিয়ান যুগে জন্তুদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভ করেছিল দৈত্যাকৃতির ডাইনোসরেরা। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেরই ধমনীতে ছিল সমুদ্রে ফিরে যাবার আদিম ডাক। যার ফলে কিছু সরীসৃপেরা আবার ফিরে যেতে লাগল জলে, সাঁতার কাটতে লাগল নদীতে, হ্রদে—এমন কি উন্মুক্ত সমুদ্রে। মেসোসর (Mesosaur)-এরা যেন সমুদ্রে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এরা ছিল ২৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রচণ্ড সাহসী এবং হিংস্র। দেখতে অনেকটা কুমীরের মত। কিন্তু এরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়। এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পাথরে। এ দুটি মহাদেশ যে ঐ সময়ে সংলগ্ন ছিল তার নিদর্শন ঐ জীবাশ্মগুলি।

২৩ কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক (Triassic) যুগে সমুদ্রে-ফেরা সরীসৃপেরা বর্তমান মাছ-খেকো সামুদ্রিক গিরগিটির মত দেখতে হল—যাদের নাম ইক্‌থিওসরাস্ (Icthyosaurus)। স্থলে ব্যবহৃত লম্বা পাগুলি জলে ব্যবহারের ফলে রূপান্তরিত হয়ে চ্যাপ্টা দাঁড়ের মত দেখতে হল। লম্বা লেজ ছোট হয়ে শক্তিশালী পাখনায় (fin) পরিবর্তিত হল। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার মাটির টানে সমুদ্রতটে ফিরে আসতে শুরু করল এবং তাদের বুকে হাওয়া নেবার জন্যে ফুসফুস গড়ে উঠল। এদের বাচ্চারা জন্ম নিত জলের নিচে লম্বা লেজ সমেত; লেজের সাহায্যে উপরে সাঁতরে এসে হাওয়া নিতে অভ্যাস করত। ইক্‌থিওসরাস্‌দের খুব বড় চোখ এবং সম্ভবতঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, আর ছিল খুব ধারালো বড় বড় দাঁত।

প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস্ (Cretaceous) যুগের অবসান ঘটে। এই যুগটা ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ ডাইনোসরের রাজত্বের শেষকাল; এবং তার সাথে ছিল তার গোত্রের বহু সরীসৃপেরা। এটাকে বলা হয় সরীসৃপ যুগ। বিশাল দৈত্যাকৃতির ডাইনোসরের পদভারে মেদিনী নিত্য প্রকম্পিত হত। সমুদ্রে ছিল সামুদ্রিক ড্রাগন—২৫ ফুট লম্বা টাইলোসরাস্ (Tylosaurus)। আকাশে চরে বেড়াত উড়ন্ত সরীসৃপ

টেরানোডন (Pteranodon) যাদের দেহ ছিল ২৭ ফুট লম্বা এবং ডানাগুলি বাদুড়ের মত চামড়ায় ঢাকা। ডানাদুটির গায়ে লাগানো ছিল বড় বড় চারটে আঙ্গুল। কিন্তু ক্রিটেশাস যুগের শেষে হঠাৎ এদের অবলুপ্তি ঘটতে শুরু করে এবং বর্তমানে কয়েকটি সমুদ্র-সর্প, কুমীর এবং সামুদ্রিক গিরগিটি ছাড়া এদের আর কোনো রূপের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

প্রাচীন জীবের অপরিবর্তিত রূপ বর্তমানে খুব কমই দেখা যায়। আগেই বলেছি আনটার্কটিকার উপকূলে আদিমতম কিছু ব্লু-গ্রীন এল্‌জী ছাড়া যে প্রাচীন জীবের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে ১৯:৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে প্রাপ্ত কোলাকান্থ (Coelacanth) বিশেষ আশ্চর্যজনক। এই প্রজাতির ৭ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা কিন্তু সমুদ্রে বিশেষ কোনও স্থানে এরা লুকিয়ে প্রায় ১০ কোটি বছরে কাটিয়েছিল। অবশ্য পৃথিবীতে এরা একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার এক বিশেষ উপকূলে বর্তমান এবং সংখ্যায় খুবই কম। এই কোলাকান্থদের লাটিমেরিয়া প্রজাতিভুক্ত ধরা হয়। এরা মাপে চার থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট হয় এবং ওজনে ৭০ থেকে ১৮০ পাউণ্ড।

জীবাশ্ম গবেষণায় পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে ইতিহাসের মাপকাঠি ভূ-তাত্ত্বিকেরা তৈরি করেছেন তা নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস

[প্রধান ঘটনাপঞ্জী] (চিত্র ২২)

প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)

১০ লক্ষ বছর আগে। চারটি তুষার যুগ। বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব বিনষ্ট হল। মানুষের জন্মলাভ হল।

টারসিয়ারী (Tertiary)

১০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে। মহাদেশের সৃষ্টি। বর্তমান উদ্ভিদ্ আবির্ভাব, স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য।

ক্রিটেশিয়াস (Cretaceous)

৬ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ জল প্লাবিত হল। ডাইনোসরেরা ধ্বংস হল।

জুরাসিক (Jurassic)

১৩ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১৮ কোটি ১০ লক্ষ বছর আগে। আবহাওয়া শান্ত হল। বৃহদাকৃতি স্থলচর ও জলচর ডাইনোসরেরা ও দন্তবিশিষ্ট পক্ষী।

ট্রাইয়াসিক (Triassic)

১৮ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ২৩ কোটি বছর আগে। রৌদ্রদগ্ধ আবহাওয়া। ডাইনোসরেরা, স্তন্যপায়ী জীবের সমাকৃতি ও প্রথম পুত্তলী পতঙ্গ।

পারমিয়ান (Permian)

২৩ কোটি থেকে ২৮ কোটি বছর আগে। প্রান্তস্থিত বা চূড়ান্ত আবহাওয়া। ট্রাইলোবাইটের অবলুপ্তি। সরীসৃপেরা প্রচুর পরিমাণে জন্মাল।

কারবোনিফেরাস (Carboniferous)

২৮ কোটি থেকে ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া। কয়লা, জলাভূমি বা বিল, অরণ্য ও বৃহদাকৃতির কীটপতঙ্গ।

ডেভোনিয়ান (Devonian)

৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে। বিভিন্ন আবহাওয়া, প্রচুর মাছ। উভয়চরেরা, কীটপতঙ্গেরা আবির্ভূত হল।

সিলুরিয়ান (Sliurian)

৪০ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে। শান্ত আবহাওয়া। প্রচুর প্রবাল দ্বীপ। স্থলে প্রথম জীবের জন্ম।

অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)

৪২ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে। শান্ত আবহাওয়া। সামুদ্রিক লতা, নটিলয়েড (সামুদ্রিক শম্বুক), প্রথম মেরুদণ্ডী।

কেম্ব্রিয়ান (Cambrian)

৫০ কোটি থেকে ৬০ কোটি বছর আগে। সাধারণ ভূ-পরিবর্তন। ট্রাইলোবাইট, শামুক, কঠিন খোলার প্রাণী (Crustaceons)

প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান যুগ (Pre-cambrian)

৬০ কোটি বছর আগে। ভূত্বকের নিরবিচ্ছিন্ন আলোড়ন। নরম শরীরের সামুদ্রিক জীবের আবির্ভাব।

জীব বিবর্তনের ঘটনাপঞ্জী ২'২নং চিত্রযুক্ত ছকে দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্রে বর্তমান জীবনরূপ

জীবজগৎকে মোটামুটি ১২টি প্রধান পর্বে (phyllum) ভাগ করা যায় (চিত্র নং ২'৩), সব ক'টিরই সূত্রপাত ঘটেছিল সমুদ্রের জলে। আজকের সমুদ্রেও সব ক'টি পর্বের রূপ দেখা যায়। সমুদ্রে বাসকারী জীবের বিচিত্র-রূপের কিছু এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটে তাদের স্বাভাবিক রং সহ দেখানো হয়েছে; রূপকথার পাতালপুরীর বিচিত্র বর্ণাঢ্য রূপের এক পরিচয় যেন এতে পাওয়া যায়।

উপরের বামদিকে উড্ডীয়মান খয়েরী রংএর মাছটির নাম মানটা (manta); এদের বিস্তার বিশ ফুট। মাঝের উড়ুক্কু মাছেরা সাধারণতঃ ছোট আকারের হয়, লম্বায় মাত্র নয় ইঞ্চি। ডানায় ভর করে হাওয়ায় ২২৫ মিঃ পর্যন্ত একটানা ভেসে বেড়ায়। ডান দিকে জল থেকে নির্গত শলাকার মত ঠোঁটওয়ালা নীল রংএর মাছটির নাম নীল মারলিন; এরা লম্বায় দশ ফুট হয়। এদের মাঝে বড় করে দেখানো পিঠের পাখনায় পাল তোলা মাছটির নাম রাখা হয়েছে পাল তোলা মাছ (sail fish); এরা আট ফুটের ও বেশী হয়।

সমুদ্র জলের মধ্যে দেখানো মাছগুলির মধ্যে অনেকগুলি খুব পরিচিত যেমন, চিংড়ি, তারা মাছ ইত্যাদি। কিন্তু এদের সাথে চ্যাপ্টা পাতার মত খুব বড় করে দেখানো হয়েছে ইল-মাছের লারভা বা শুককীট। নীচে বাঁদিকে দু'টি পলায়মান মাছের আক্রমণকারী আগ্রাসী হাঁ-করা বহু দাঁত-যুক্ত সাপের মত মাছটির নাম ভাইপার সাপ মাছ (Viper

২৩: জীব জগতের বারোটি পর্ব
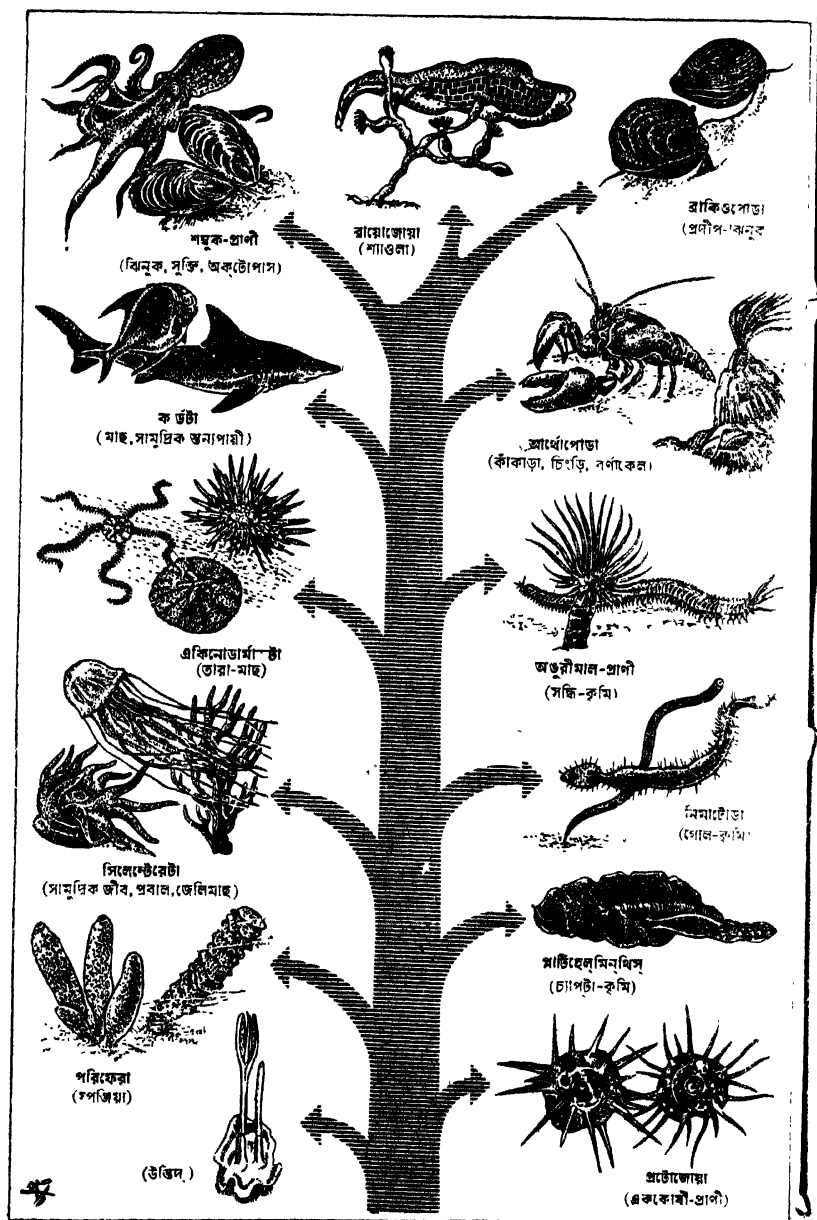
fish)। কোণে লাল রংএর সী এনিমোন বা সাগর কুসুম গোলাপী নরম শুঁড়গুলি ছড়িয়ে রেখেছে শিকার ধরার ফাঁদ পেতে।

এবারে আলোচনা করা যাক, সমুদ্রের সব কয়টি প্রাণী-পর্ব সম্পর্কে। সমুদ্রে সরলরূপের এককোষী প্রোটোজোয়া থেকে জটিল বহুকোষী স্তন্যপায়ী জন্তু পর্যন্ত সকল প্রকারের প্রাণী বর্তমান। এরা যে বারোটা পর্বভুক্ত, তাদের আলোচনা নীচে করা হল (চিত্র ২'৩)।

(১) আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া (Protozoa) : এরা অণুবীক্ষণিক ও এককোষী। এমিবা ও রোগজীবাণু এই পর্যায়ভুক্ত।

(২) স্পঞ্জ বা পরিফেরা (Porifera) : এরা সমুদ্রতলে আটকিয়ে স্থাণুবৎ থাকে। এদের সমস্ত দেহত্বকে আস্টিয়াম নামের ক্ষুদ্রাকৃতির ঝর্ণামুখ এবং দেহাগ্রে অসকিউলাম নামের বড় ঝর্ণাছিদ্র থাকে। এ ছাড়া গায়ে স্প্যাইকিউল নামের ছোট ছোট সূচ্যাকৃতি পদার্থ পরস্পরে জুড়ে থেকে দেহটাকে মজবুত রাখে। যেমন, সাইকন্, অলিনথাস্, স্পঞ্জিলা।

(৩) একনালীদেহী প্রাণী বা সিলেনটেরেটা (Coelentereta) : সাধারণতঃ এরা ছত্রাকার বা নলাকার দেহে কর্ষিকা বিস্তার করে সমুদ্রে বাস করে। এরা দেহ-ত্বকের দংশক কোষ দ্বারা শিকার ধরে। যেমন, হাইড্রা, জেলীফিস, সাগর কুসুম, প্রবাল কীট।

(৪) চ্যাপ্টাকৃমি বা প্ল্যাটিহেলমিনথিস্ (Platyhelminthes) : এদের চ্যাপ্টা লম্বা দেহ, এঁকে বেঁকে চলে। গায়ে কাঁটা ও চোষণের অজস্র মুখ। যেমন, যকৃতকৃমি, ফিতা কৃমি।

(৫) গোল কৃমি বা নেমাটহেলমিনথিস্ (Nemathelminthes) : এরা সাধারণতঃ বড় জীবের গায়ে পরজীবী হিসাবে বাস করে। যেমন, সূতাকৃমি, আসকেরিস।

(৬) অঙ্গুরীমাল প্রাণী বা এ্যানিলিডা (Annelida) : এদের নলাকার দেহ কতকগুলি আংটিরমত দেহখণ্ডদ্বারা তৈরী। যেমন, জোঁক, কেঁচো, নেরিস।

(৭) সন্ধিপদ বা আর্থোপোডা (Arthropoda) : এদের দেহগুলি

খণ্ড খণ্ড অংশে গঠিত। খণ্ড গুলি পৃথক ভাবে কখনও মস্তক, বক্ষ বা উদর। যেমন, জলে চিংড়ি ও স্থলে মাকড়সা, জলে কাঁকড়া ও স্থলে কাঁকড়া বিছা, তেতুল বিছা।

(৮) শম্বুক জাতীয় প্রাণী বা মোলাস্কা (Mollasca): শক্ত আবরণের মধ্যে নরম শরীরের এই জীবগুলির ফুসফুস থাকে। যেমন, অক্টোপাস, ঝিনুক, শামুক।

(৯) কণ্টকত্বক প্রাণী বা একিনোডারমাটা (Echinodermata): এদের ত্বক শক্ত ও কণ্টকাবৃত এবং সারিবদ্ধ নলাকার চলার পায়ের শীর্ষে চোষক থাকে। যেমন, তারামাছ, সমুদ্র শশা, পালক তারকা।

(১০) কর্ডাটা বা মেরুদণ্ডী (Chordata): কংকাল-স্বরূপ বা নমনীয় পৃষ্ঠদণ্ডের এই জীবেরা আমাদের সুপরিচিত। যেমন, মাছ ও অনেক সামুদ্রিক বড় জন্তুরা।

(১২) স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয়া (Mammalia): এরা জরায়ুজ এবং সন্তানদের স্তন পান করায়; এদের রক্ত উষ্ণ এবং চোয়ালে অনেক দাঁত থাকে। যেমন, সমুদ্রে তিমি, শীল, স্থলে মানুষ, কুকুর, বাদুড়।

(১২) ব্রায়োজোয়া (Bryozoa): এরা শ্যাওলাজাতীয় প্রাণী।

বর্তমান সমুদ্রে জীবের চক্রক্রম

একাধিক জীবের সংহারে অপর জীবের শারীরিক বিবৃদ্ধি জীবনের এক শাশ্বত চক্র। ২.৪ নং চিত্রে এই চক্র দেখানো হয়েছে ছবির মাধ্যমে। কি করে ক্ষুদ্র জীবের উপাদানে বৃহত্তর জীব এবং তা থেকে থেকে ক্রমে বৃহত্তর জীবের (এমন কি বৃহত্তম জীব তিমির) সৃষ্টি হয় তা দেখানো হয়েছে।

নদীর জল বহুল পরিমাণে জৈব পদার্থ বহন করে সমুদ্রে ফেলে। এ ছাড়া সমুদ্রের বহুলাংশ (নব্বই শতাংশ) জৈব পদার্থ অগভীর সমুদ্রের আলোকিত (ইউফোটিক) অঞ্চলে গঠিত হয় বিভিন্ন প্রকারের এক কোষী সবুজ জলজ ফাইটোপ্লাঙ্কটনের শরীরে। অগভীর সূর্যালোকিত অঞ্চলে জলজ উদ্ভিদ জন্মে যাদের উপর বেঁচে থাকে এই অসংখ্য প্রকারের ফাইটোপ্লাঙ্কটন (যথা—ডায়াটম, ফ্রজেলেট ইত্যাদি)। এদের খেয়ে বেড়ে

শুঠে ছোট ছোট মাছেরা (যেমন টেরোপোড, কাঁকড়া ইত্যাদি)। চিত্রে খাদ্যের শরীর থেকে খাদকের সৃষ্টিকে তীর দিয়ে সংযোজিত করা আছে।

ইউফোটিক অঞ্চলের নীচেই আছে স্বল্পালোকিত মধ্যাঞ্চল (মেসো-

২.৪ (ক) সমুদ্রে বর্তমান জীবন-রূপ ঃ মহীসোপান থেকে সমুদ্রের গভীরে বেনথিক অঞ্চল পর্যন্ত ; খাদ্য পুষ্টির চক্রক্রম দেখানো হয়েছে তীর চিহ্নের সাহায্যে।

পেলাজিক জোন) এবং তার নীচে সাঁঝের মত আলোকিত অঞ্চল

(বেথিপেলাজিক জোন)। গভীর মহান্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রতল বেনথিক অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয় (চিত্র ২°৪খ)।
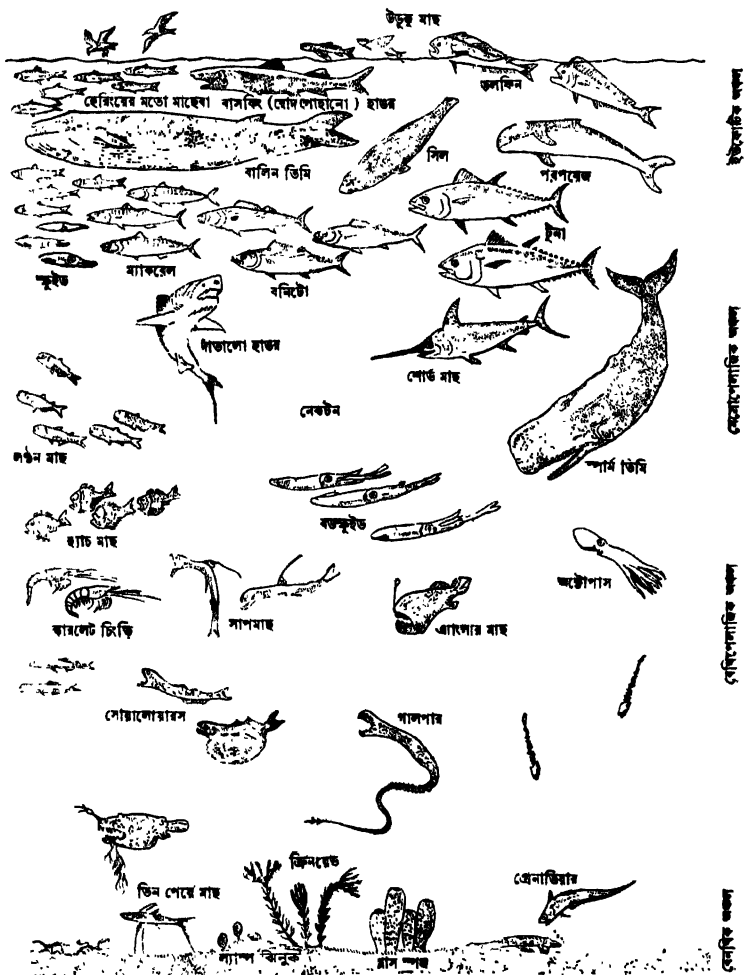
২'৪ (খ) সমুদ্রের অগভীর ইউফোটিক অঞ্চল থেকে বেনথিক অঞ্চলের অন্য জীবজন্তুদের পরিচিতি দেওয়া হল।

সমুদ্রেও জীবনের উপাদানের মূল উৎস খুঁজে পাওয়া যায় সৌরালোকে। কেমন ভাবে তা বলছি এবারে।

সৌরালোকে অগভীর জলে সৃষ্ট হয় সবুজ উদ্ভিদ বা শ্যাওলা। সূর্য থেকে আগত প্রতি লক্ষ আলোক ফোটন কণিকার প্রায় একটা ফোটন শক্তি খাদ্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়; এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ সমুদ্রের জলজ ফাইটোপ্লাঙ্কটনের মধ্যে নিহিত থাকে।

স্থলে সাধারণ উদ্ভিদ খেয়ে ছোট ছোট কীট, পতঙ্গ, শামুক ও অন্যান্য ছোট প্রাণী বড় হয়। তাদের খেয়ে আরও বড় হয় বৃহত্তর কীট, পাখী এবং গিরগিটিকুলেরা। এদের খেয়ে আরও বৃহদাকারের মাংসাশী জন্তু ও জানোয়ারেরা বেড়ে ওঠে।

সমুদ্রের জলে বড় ডায়াটম ও ফ্লাজেলেট উপরে ভেসে বেড়ায় এবং অনেক পরিমাণে নীচে ডুবে যায়। যেখানে সমুদ্রের জল স্রোতে উপরে উঠে আসে সেখানে খাদ্যপুষ্টি পেয়ে ডায়াটম বেশী জন্মায় এবং অনেক সময় জলের রং পাল্টে দেয়। লোহিত সাগরের রং লাল হয়েছে এদেরই জন্যে। এই ডায়াটম হল হেরিং প্রভৃতি মাছের প্রধান খাদ্য। তিমির প্রধান খাদ্য হল প্লাঙ্কটন্।

উত্তর আটলান্টিকের দক্ষিণ পশ্চিমে সার্গোসা সমুদ্রে ৫০০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত আছে সার্গাসাম্ নামের জলজ আগাছা; এতে আগে পালতোলা জাহাজগুলো আটকে যেত।

তিমি মাছ নয়। এরা স্তন্যপায়ী এবং এদের রক্ত উষ্ণ। উত্তর এবং দক্ষিণ সাগরে বেশী দেখা যায়। এরা ৮০ থেকে ১০০ ফুট লম্বা হয়। নীল তিমি ১০০ টনের বেশী হতে পারে (একটা বড় হাতী ৩-৪ টনের হয়)। তিমিরা সাধারণতঃ প্লাঙ্কটন ও ছোট মাছ খায়। বালিন তিমির মুখে থাকে ছোট ছোট হাড়ের ঝাঝরা (চিত্র ২·৪খ দ্রষ্টব্য)। হাঁ-করে মাছ ভরা জল নিয়ে ঝাঝরায় ছেঁকে জল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। তিমিদের মাছের মত শ্বাসযন্ত্র নেই, ফলে ২০-২৫ মিনিটের বেশী ডুবে থাকতে পারে না; উপরে উঠে শ্বাস নিয়ে আবার জলের নীচে চলে যায়। দম ছাড়ে মাথার উপরের ফুঁটো দিয়ে এবং ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে পড়ে। এই ফোয়ারা

দেখে তিমি শিকারীরা অস্ত্র ক্ষেপণ করে। তিমির হাড়ের ঝাঝরা, মাথার তেল ও চর্বির লোভে শিকারীরা ঘুরে বেড়ায়।

সমুদ্রের ৬,০০০-১৫,০০০ ফুট গভীরে নেমে ডুবুরীরা অনেক জীবের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছে। এখানে প্রাণীর ঘনত্ব অনেক কম। অন্ধকারাচ্ছন্ন বেনথিক অঞ্চলে বেশী বড় মাছ দেখা যায় না; সেখানকার মাছেদের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ চার ইঞ্চি থেকে এক ফুট হয়। এখানে বড়রা ছোটদের ধরে খায়; ছোটরা বেঁচে থাকে উপরে মৃত জীবের নিমজ্জিত দেহাংশ ভক্ষণে।

১৫০ রকমের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা গেছে। বাইন মাছ থেকে ৩০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি হয়। হ্যাচ বা কুড়ুল মাছের গায়ের দু পাশে বেগুনী ও সবুজ রং-এর আলো জ্বলে।

লণ্ঠন মাছেরা প্রয়োজনমত আলো জ্বালতে ও নেভাতে পারে। তাতে এরা যেমন খাদ্য দেখতে পায় তেমনি এদের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে বড় মাছেরা এদের খেয়ে ফেলে। কিছু চিংড়িও এই ধরনের আলো জ্বালতে পারে এবং এই আলোর দ্বারা অনেক সময় শিকারী মাছকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এদের অনেকের শরীর কাঁচের মত স্বচ্ছ এবং শরীরের মধ্যকার রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদির কার্য স্পষ্ট দেখা যায়।

স্কুইড মাছের গায়ের রং ক্রমাগত বদলে হয় লাল-ধূসর বা নীল। সোরড্ বা তলোয়ার মাছেরা সামনের শক্ত বর্শার মত ঠোঁট দিয়ে শিকার বা শত্রুকে আক্রমণ করে।

সোয়ালোয়ার্স্ বা রাক্ষুসে গেলা-মাছের উদরই সর্বস্ব। এরা পেটকে দরকার মত এত বাড়াতে পারে যে নিজের শরীরের ওজনের চাইতে বড় মাছ গিলে ফেলে।

স্পঞ্জ খুব নরম ফাঁপা ও হাল্কা কংকালে গঠিত। অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট এই কংকাল চাপে ছোট হয়। ছিদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত জলে ভেসে-আসা

খাদ্য আহরণ করে স্পঞ্জ বড় হয়। খাদ্য গ্রহণের পর শরীরের মাঝ বরাবর সোজা নল দিয়ে জল বের করে দেয়।

স্কুইডের গায়ে লম্বা টুপি থাকে। অক্টোপাশের আটটা শুঁড়ের নীচে থাকে জোরালো চোষবার যন্ত্র, যার সাহায্যে শিকারের রস-রক্ত শুষে নেয় এবং কখনও বেগতিক দেখলে শরীর থেকে কালো রং ছিটিয়ে (অর্থাৎ চোখে ধূলো দিয়ে) পালিয়ে যায়।

এই ছবিতে সমুদ্র তলে দাড়িয়ে থাকা তিন-পেয়ে মাছের উপরে দেখা-যাচ্ছে ঘুরে বেড়ানো দাড়িওয়ালা হিংস্র শয়তান মাছ বা ডেভিল ফিস্।

এরা ছাড়া আরও দেখানো আছে উপরের অংশে মেডুসা, কোপ্‌পড্, ডলফিন, টুনা ও ম্যাকরেল মাছ। অনেক নীচে সাপ মাছ, অ্যাংলার মাছ, গালপার, গ্রেনাডিয়ার ইত্যাদি। ভুক্ত মৃত মাছের মাসহীন কংকালের অবশেষ কয়েকটিকে নীচের স্তরে নেমে যেতে দেখা যাচ্ছে। এগুলি বেনথিক জোনে জীবাশ্মের উপাদান যোগাবে।

তৃতীয় পর্ব

সমুদ্র গবেষণা

সূচনা ঃ

সমুদ্রতল গবেষণা কতকগুলি বিষয়ের দিক থেকে মহাশূন্য গবেষণার চেয়ে জটিল। যুগ যুগ ধরে মানুষ সমুদ্রের অন্তস্থলের সন্ধান জানবার চেষ্টা করেছে। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু হয়ে কলিম্ফা নামক এক যন্ত্রের মধ্যে বসে সমুদ্র গভীরে নেমেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এ গবেষণা একটি বিশেষ রূপ নেয়।

সমুদ্র গবেষণার বিশিষ্ট পদক্ষেপে বিগ্‌ল (১৮৩১-১৮৩৬)
ও চ্যালেঞ্জার (১৮৭২-১৮৭৬)

চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বিগ্‌ল্ (H. M. S. Beagle) জাহাজে সমুদ্রযাত্রার ফলে সমুদ্র ও জীব জগতের বিবর্তন সম্পর্কে অনেক তথ্য যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তেমনি জন্ম নিয়েছিল ডারউইনের বিখ্যাত তথ্য—প্রাণের বিবর্তনে বংশ রাখতে পারে তারাই যারা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং নিজেদের সব চাইতে বেশী সময়োপযোগী করে তুলতে সক্ষম। এই বিগ্‌ল জাহাজ পাঁচ বছর (১৮৩১-১৮৩৬) ধরে সমুদ্রের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাকে রূপ দিয়েছিলেন ডারউইন তাঁর *The Origin of the Species* বইতে। ২৪শে নভেম্বর ১৮৫৯ সালে বইটি প্রকাশের একদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। একদিনে নিঃশেষিত হবার ইতিহাস বই জগতে বোধ হয় এই প্রথম।

বিগ্‌ল-এর ৩৬ বছর পর ১৮৭২ সালের মে মাসে ইংল্যাণ্ড থেকে ২৩০০ টনের গবেষণা জাহাজ চ্যালেঞ্জার (E. M. S. Challenger) সমুদ্রযাত্রা করে। জাহাজটি সাড়ে তিন বছরে সাত সমুদ্রে ৬৮,৮৯০

মাইল অতিক্রম করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রতল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা। অবশ্য এর প্রায় ৩০০ বছর আগে মাগেলান সমুদ্রতল সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রথম জানিয়েছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী ৩০০ বছরে এই গবেষণা আর বেশী দূর এগোয় নি।

চ্যালেঞ্জার প্রথমে আঁকাবাঁকা পথে আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক তথ্য নিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ হয়ে ভারত মহাসাগর, আনটার্কটিক সাগর হয়ে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পেরিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে। হাওয়াই ও তাহিতি দ্বীপপুঞ্জে কিছুকাল কাটিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে আবার আটলান্টিক হয়ে ১৮৭৬ সালের ২৪শে মে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। এর রিপোর্ট বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশেষ দলিল, যা ৫০ খণ্ডে লিখিত। এর ফলে সমুদ্রে জীবের ৭১৫টি গণ (genera) এবং ৪,৪১৭টি প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়। উল্লিখিত সমুদ্রগুলির সমুদ্রতলের মানচিত্র প্রথম তৈরী হয় এবং বহু-প্রচারিত আটলান্টিসের অন্তর্ধানের কাহিনী নিছক কল্পনা বলে প্রমাণিত হয়।

এই চ্যালেঞ্জারের যাত্রীদের বিজ্ঞান-তাগিদায় কার্যক্রম বরাবরই সুষ্ঠু ও নিরাপদ ছিল না। ২৪০জন নাবিকদের মধ্যে ৭ জন এ যাত্রায় জীবন হারায়। তাদের মধ্যে মারা যান—দু'জন জলে ডুবে, এক জন রোগে এবং অন্যান্যেরা দুর্ঘটনা ও অন্য কারণে। কয়েকজন ত জাহাজ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়াতে নেমে যান। বিজ্ঞান ছাড়াও কিছু মানবিক তাগিদায় রোমহর্ষক বা চিত্তাকর্ষক ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল ওদের সাড়ে তিন বছরের যাত্রাপথে। অনেক ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা বলা যেতে পারে, যেমন—দক্ষিণ আটলান্টিকের ট্রিস্টান দ্বীপে থামার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে নাবিকেরা জানতে পারলেন যে স্টোলটেন হফ্ নামীয় দুই ভাই একটি দুর্গম দ্বীপে শীল শিকারে গিয়ে দুই বছর ধরে আটকে পড়ে আছে। খবর শুনে উত্তেজিত নাবিকেরা গবেষণা জাহাজটিকে ঐ দুই ভাই-এর উদ্ধারকার্যের জন্যে ঐ দ্বীপ অভিমুখে চালনা করে। অবশেষে দ্বীপের সন্ধান মিলল এবং আশ্চর্য, সেই দুই ভাইকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল

খাদ্যের অভাবে ওরা বেঁচে ছিল শুধু মাত্র পেঙ্গুইনের ডিম ও বুনো শূওর খেয়ে। সেখানে তারা কোনো শীল মাছ ধরতে পারে নি। এরই কিছু দূরে নাইটিংগেল দ্বীপে হাজার হাজার পেঙ্গুইনকে দেখা গেল। সেখানে সমুদ্র বেলাভূমি পেঙ্গুইনের ডিমে এমন ভাবে ঢাকা ছিল যে তাঁদের ডিমে পা না ফেলে হাঁটা সম্ভব ছিল না। আর পেঙ্গুইনেরাও তাদের আবাস এমনভাবে পাহারা দিচ্ছিল যে জাহাজের কুকুর নামতেই তেড়ে এসে ঠুকরে মেরে ফেলে। এ ধরনের বহুবিধ সুখ-দুঃখ, মজা-রোমহর্ষক অবস্থার ভেতর দিয়ে চ্যালেঞ্জার গভীর সমুদ্রের বহুল তথ্য নিয়ে ফিরে আসে।

বর্তমান গবেষণা

সমুদ্রের নীচে গবেষণার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান জলচাপ ও জলে বেশীক্ষণ থাকার সুব্যবস্থা করা। প্রতি ১০ মিটারে জলের চাপ ৬'৩৫ কিলোগ্রাম করে বাড়ে। তার ফলে, মোটে ৯১৫ মিটার নীচে চাপ এত বেশী হয় যে, মানুষের দেহ অনায়াসে গুঁড়িয়ে জলে মিশে যেতে পারে। সমুদ্রজলে ৫০ ফুট নীচে সূর্যের লাল আভা দেখাবে হলদে, ২০০ ফুটের গভীরে নীল রং ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। তার নীচে সব কালো। সূর্যের কোনো রশ্মি ১৫০০ ফুটের নীচে পৌঁছায় না।

ব্যাথিস্কেপ বা গবেষণা ডুবো জাহাজ

এই চাপকে উপেক্ষা করে যাতে কাজ করা যায় তার জন্যে নির্মিত হয় ব্যাথিস্কেপ (Bathyscaph)। ১৯৩৪ সালে এই যন্ত্রে করে বারমুদার কাছে ২জন মার্কিন বিজ্ঞানী ৯১৫ মিটার নীচে নামেন। বর্তমানকালের ব্যাথিস্ক্যাপ নিয়ে সমুদ্রের যে-কোনো গভীরতায় নামা যায় ও গবেষণা করা যায়।

ব্যাথিস্কেপে কয়েকটি কক্ষ আছে সেগুলি গ্যাসোলিনে পূর্ণ থাকে। বাহ্যিক চাপের তারতম্যে এই গ্যাসোলিনের আয়তন কিছু বাড়ে বা কমে সমুদ্রে নামার আগে-কিছু লোহার বল ব্যাথিস্কেপের এক অংশে তড়িৎ চুম্বক দ্বারা আটকানো হয়। এদের ওজন জলের উচ্চ-চাপকে উপেক্ষা করে যন্ত্রটিকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়। নীচ থেকে উপরে ওঠবার সময় তড়িৎ

চুম্বকত্বকে কমিয়ে ঐ লোহার টুকরোগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় এবং ব্যাথিস্কেপ হাল্কা হয়ে আবার উপরে উঠতে থাকে। আজকাল এই ব্যাথিস্কেপে ইলেকট্রনিক ফ্লাশ ক্যামেরা বসানো থাকে যাতে হাজার হাজার ফটো নেওয়া যায়। গবেষণার সুবিধার জন্যে স্বাভাবিক বর্ণের ছবিও নেওয়া হয়ে থাকে।
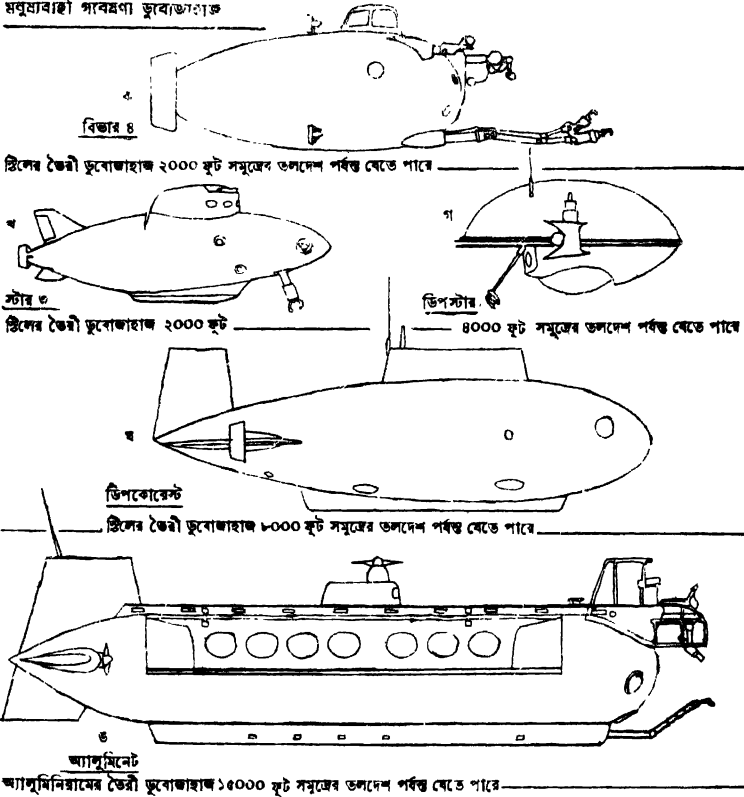
৩.১ : মনুষ্যবাহী নানা গবেষণা ডুবো জাহাজের আকৃতি ও তাদের বিভিন্ন গভীরতায় যাবার ক্ষমতা দেখানো হয়েছে।

ব্যাথিস্কেপের একটা অসুবিধা হল, এটাকে সব দিকে খুশিমত ঘোরানো বা চালানো যায় না। ডেনিজ (Denise) বলে একটা কচ্ছপাকৃতি জল-

জেট-বাহিত যন্ত্র স্বচ্ছন্দগতিতে উপরে নীচে ডানে বাঁয়ে ঘুরতে পারে এবং চলতে পারে। এতে দুজনে বসবার ব্যবস্থা থাকে এবং সামনের দুটো প্লাস্টিকের ছিদ্র দিয়ে জলের তলাকার অবস্থা দেখা যায়। এর সাহায্যে ৩২৫ মিটার পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। বিভিন্ন মনুষ্যবাহী গবেষণা ডুবোজাহাজের ছবি দেওয়া হয়েছে ৩·১ নং চিত্রে।

এ ছাড়া গভীর জলের সাঁতারু বা ডাইভাররা সমুদ্রের বহু স্থানের খবর দিয়েছে। ১৯০১ সালের অ্যান্টিকিথেরা দ্বীপের পাশে ২০০০ বছর আগেকার গ্রীকদের এক ডুবন্ত জাহাজ আবিষ্কৃত হয়। এই ডাইভারদের aqualung থাকে অর্থাৎ পিঠে থাকে একটা উচ্চ-চাপযুক্ত বায়ুবাহী আধার, দাঁতের মাঝে শক্ত করে কামড়ে রাখে মুখাবরণ। পায়ে লাগান থাকে ব্যাঙ-এর পায়ের মত জাল।

এই সকল প্রচেষ্টার সাহায্যে জানা গেছে যে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার মিটার নীচে পর্যন্ত জলের মধ্যে দৃষ্টি চলে কিন্তু তার নীচে অন্ধকার এত জমাট যে কিছুই দেখা যায় না। অবশ্য আলোকবাহী সামুদ্রিক জন্তু বা ইলেকট্রিক মাছ মাঝে মাঝে এক ঘেঁয়ে অন্ধকার কেটে দিয়ে যায়।

সমুদ্রের পর্বতশ্রেণী

সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে কোথাওবা সুউচ্চ পার্বত্যাঞ্চল, কোথাও বা সুগভীর খাদ। এই পার্বত্যাঞ্চলে কয়েকটি পর্বত মাউণ্ট এভারেস্টের চাইতে উঁচু। কিছু কিছু পর্বত-শীর্ষ সমুদ্রের জলের উপর মাথা তুলে দ্বীপমালার সৃষ্টি করে।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়া প্রায় সকল মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৬৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। এদের মধ্যে সব চাইতে বড় হচ্ছে মধ্য আটলান্টিক শ্রেণী। এখানে পর্বতশ্রেণী ৮০০ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং ১৬,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই সকল পর্বতশ্রেণীর পাশেই আছে বিশালকৃতির এবং সুগভীর খাদ। এই পর্বত ও খাদগুলি ভূ-কম্পন অঞ্চল গঠন করে।

১৯৬৪ সালের ২৭শে মার্চ গুড ফ্রাইডেতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আলাস্কাতে এক অতীব ভয়াবহ রকমের ভূ-আলোড়ন হয়ে গেল। তার ফলে উঠল ১২ ফুট উঁচু ঢেউ। সাময়িক এই ভূ-কম্পন জনিত উচ্ছ্বাস ছাড়াও বহুবার স্ফীতি হয়েছে সমুদ্রের জলপৃষ্ঠের। অবনতিও হয়েছে এবং তার ফলে ঘটেছে তটভূমির বিস্তার অথবা মহাপ্লাবন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রোড্‌স ফেয়ারব্রিজ দেখিয়েছেন যে প্রায় ৬,০০০ বছর আগে সমুদ্র প্রায় ১৪ মিটার ফুলে উঠেছিল। তার ফলে তখনকার দিনের প্রায় সকল মনুষ্য-বাসস্থানে মহাপ্লাবন ঘটেছিল।

গভীর জলের চলাফেরা

সমুদ্রের জলেও স্তরীভবন দেখা যায়। অর্থাৎ একটা স্তরের ঘনত্ব ও অন্যান্য গুণ নীচের এবং উপরের স্তর থেকে তফাৎ। এই রকমই একটা স্তর Deep Scattering Layer বা সংক্ষেপে DSL। এই স্তর বেশী ফ্রিকোয়ান্সি-যুক্ত শব্দ তরঙ্গকে বিচ্ছুরিত করে, ফলে এর নীচে সাবমেরিন থাকলেও শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে উপরের জাহাজ থেকে সন্ধান করা যায় না। এই স্তরের অবস্থান স্থির নয়; রাতে উপরে উঠে এবং দিনে ৯১৫ মিটার পর্যন্ত নীচে নেমে যায়।

আগেই বলেছি মহাসমুদ্র গবেষণার জন্য বিশেষ অভিযান হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন চ্যালেঞ্জার সাড়ে তিন বছর ধরে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা লিখিত হয়েছিল ৫০ ভল্যুমের গ্রন্থাবলীতে। বর্তমান ইলেক্‌ট্রনিকসের সাহায্যে গবেষণা আরও ব্যাপক করা সম্ভব হয়েছে।

মহাসমুদ্র গবেষণায় নীচেকার পলল এবং শিলা ছাড়াও গভীর সমুদ্রের জল বিভিন্ন গভীরতা থেকে সংগৃহীত হয় নানসেন নামক একপ্রকারের আধারের সাহায্যে। এই জল পরীক্ষার দ্বারা গভীর তলদেশে জলস্রোতের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়। ঐ জলের বয়সও নির্ধারণ করা হয় তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪ এর পরিমাণ থেকে। জলের বয়স বলতে কোন একটি স্থানে প্রায় অচলমান অবস্থায় থাকার সময়টাকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে জলের বয়স বলতে কি বোঝায় তা বলা প্রয়োজন।

সমুদ্রজলে খুব সামান্য পরিমাণ কার্বন-১৪ থাকে। এই পরিমাণ আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে যদি না কসমিক রশ্মি (Cosmic radiation) বা কোনো প্রকার তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসে। মোটে ৫,৬০০ বৎসরে কার্বন-১৪ এর অর্ধেক তেজস্ক্রিয়তা বিনষ্ট হয়। বাকী অর্ধেকের জন্য আরও কয়েকগুণ ৫,৬০০ বৎসর লাগে। এখন গভীর সমুদ্রের জল যদি কোনভাবে উপরে উঠে উপরের জলবায়ু অথবা স্থলে মিশবার সুযোগ লক্ষ লক্ষ বৎসরেও না পায় তবে তাদের মধ্যে কার্বন-১৪ এর পরিমাণ খুবই অল্প থাকবে। সুতরাং এই তেজস্ক্রিয় অণুটির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারলেই ঐ জল কতদিনে এক নির্দিষ্ট স্থানে ছিল তা জানা সম্ভব।

গত কয়েক লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর আবহাওয়ার বহু পরিবর্তন ঘটেছে এবং তা মানব জীবনধারাকে নির্ধারণ করছে। এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের তলদেশে পতিত পললের সংযুতির পরিবর্তন ঘটেছে। এই ধরনের পাললিক শিলা ড্রিলিং করে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা করে দেখা গেছে যে, এদের পরীক্ষার ফল থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হতে পারে।

মহাসমুদ্রে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। ১৯৫৯ সালে দক্ষিণ-
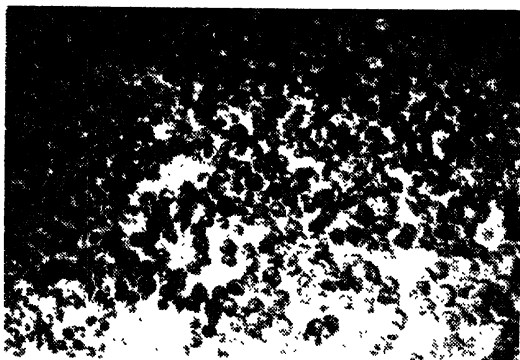
৩'২ : সমুদ্রতলে অবস্থিত বিভিন্ন আকৃতির আলুর মত ম্যাঙ্গানীজ নডিউল।

পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এই স্থানে

সমুদ্রতলে রয়েছে এক পুরু লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজের আচ্ছাদন। এই খনিজের পরিমাণ ও শ্রেণীর উৎকর্ষ বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, একটি অতিকায় হাইড্রলিক পাম্পের সাহায্যে জাহাজে তুলে অথবা ডুবন্ত ক্যাটারপিলার আর্থমুভার দিয়ে এর উত্তোলন করে সোজা ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারতমহাসাগরেও এই ম্যাঙ্গানীজ নডিউল যথেষ্ট পাওয়া যায় (চিত্র ৩'২)। তাদের পরিমাণ ও রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত মহাসাগরে অনুসন্ধান

এবারে ভারত মহাসাগর অনুসন্ধানের গোড়ার পর্ব সম্পর্কে কিছু বলব ; পরে বিশদভাবে এর আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান বা সংক্ষেপে IIOE-এর খসড়া হয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩টি দেশ ৩৮টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত জাহাজ পাঠায় ও আরও ৭টি দেশ অন্যভাবে ভারত মহাসাগর অভিযানে সাহায্য করে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ২০টা দেশের ৪০টা গবেষণা-জাহাজ এই প্রকল্পে নিয়োজিত হয়। এই অভিযানের পরিকল্পনামূলক গবেষণাও হচ্ছে স্ক্রিপ্‌স ইনস্টিটিউশন অব ওসনোগ্রাফি, লামণ্ট জিওলজিক্যাল অবসারভেটরী, স্টানফোর্ড ইউনিভারসিটি এবং উড্‌স হোল ওসনোগ্রাফিক ইনস্টিউশনে। এতে মার্কিন জাহাজ পাইওনীয়ার মালয়-সুমাত্রার মধ্যবর্তী সাগরাঞ্চলে গবেষণা করে।

সোভিয়েট ইউনিয়মের 'ভিতিয়াজ' নামে একটি জাহাজও ভারত মহাসাগরে সমুদ্র গবেষণা সংক্রান্ত অভিযান করেছে। এই সকল সংগৃহীত জলের রসায়নিক ও আইসোটপিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় জলস্রোতের দিকনির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণার ফল থেকে ভারত মহাসাগরে খনিজের সন্ধান, মৎস্য উত্তোলন ও আবহাওয়াঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা সহজ হয়েছে। সত্তর দশকের শেষাশেষি ইণ্ডিয়ান

ওসান এক্‌স্‌পেরিমেন্ট (INDEX) একটি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে।

ভারতের সমুদ্র-গবেষণা

ভারত সমুদ্র গবেষণায় বহুদূর এগিয়েছে এবং UNCLOS ভারতকে সমুদ্রের Pioneer investor-এর পর্যায়ভুক্ত করেছে। গভীর সমুদ্রে কাজ ছাড়াও নানা ধরণের গবেষণার জন্যে 'গবেষণি', 'ফারনালা' 'স্ক্যাণ্ডি সার্ভে' জাহাজ এবং নরওয়ে থেকে ভাড়া করা 'পোলার সারকেল' আণ্টার্টিক তথা ভারত মহাসাগরের অভিযানে নিযুক্ত হয়েছে। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা জাহাজ 'সাগরকন্যা' পশ্চিম জার্মানী থেকে এনেছে। এটি ১০০ মিটার লম্বা প্রায় ১৬½ মিটার চওড়া এবং গতিবেগ ১৪·২৫ নট (knots)। এই সাগরকন্যায় আছে বিভিন্ন বিষয় গবেষণার ল্যাবরেটরী যথা ভূতত্ত্ব, ভূ-পদার্থ বিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা এবং সামুদ্রিক জীববিদ্যা এবং ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির গবেষণার সর্বরকমের আয়োজন। ভারত মহাসাগর ও ভারত উপমহাদেশের মৌসুমীবায়ু ও নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির গবেষণা করা হবে জাহাজে স্থাপিত র‍্যাডার ও আকাশে ভ্রাম্যমাণ কৃত্রিম উপগ্রহের পরস্পর সংযোগের মাধ্যমে।

এই প্রকল্পে ভারতের বহু তরুণ বিজ্ঞানী দেশে ও বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। ভারতের বহু জায়গায় সমুদ্র নিয়ে গবেষণা চলছে, যেমন—সেণ্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ ইনসটিটিউট, নেভাল ফিজিক্যাল ওসেনোগ্রাফিক ল্যাবরেটরী, গোয়ার ন্যাশান্যাল ইনসটিটিউট অফ ওসেনো-গ্রাফি এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৮৩ সালের তিরুপাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সাতটি সুপারিশ কার্যকর করবার কথা হয়েছে। এই সব সুপারিশের মধ্যে আছে—এক, দেশের ছাত্র সমাজকে সমুদ্রের আবহাওয়া বিদ্যা, সমুদ্র সম্পদ গবেষণায় ও নৌচালনায় উৎসাহ প্রদান। দুই, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের উদ্যোগে সমুদ্রে সাঁতার, ডুবুরীর কাজ ও নৌকা-ক্রীড়া জনপ্রিয় করে তোলার জন্য

উপযুক্ত সংস্থার সংস্থাপন। তিন, সমুদ্র সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের আয়োজন। চার, সমুদ্রের জল-দূষণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রয়োজন হলে উপযুক্ত আইন অবলম্বন। পাঁচ, সমুদ্র গবেষণার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ছয়, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিকরা যাতে পরস্পরের যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করে সে ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ। সাত, সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারীদের সমুদ্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

চতুর্থ পর্ব

সমুদ্রতলের সৃষ্টি ও লয়

সূচনা

আমাদের জীবদ্দশায় মানচিত্রে মহাদেশগুলির আয়তন ও বিস্তার একইভাবে দেখি। এবং দেশের সীমানার সামান্য কয়েক মিটার লঙ্ঘনের জন্যে দুই দেশের মধ্যে আগ্নেয় বিনিময় ঘটে যায়। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয় যে মহাদেশগুলি পৃথ্বী-পৃষ্ঠে ঘুরে বেড়িয়েছে ভূ-তাত্ত্বিক
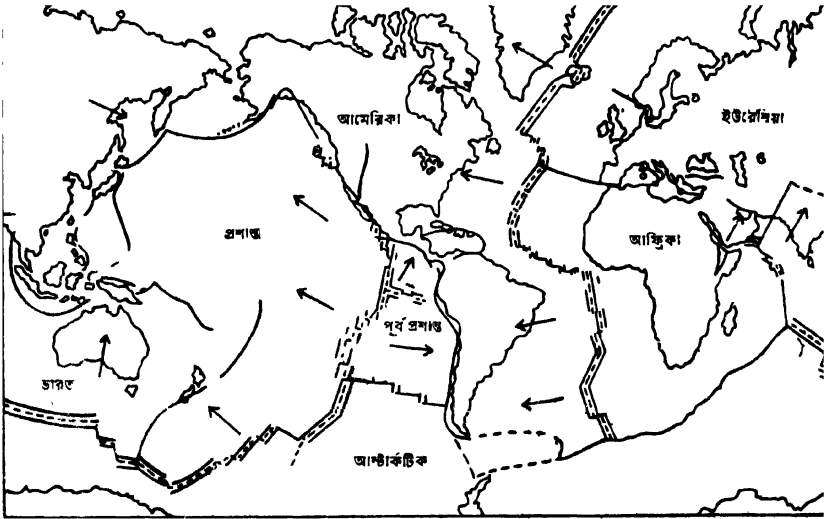
৪˙১ : ভঙ্গুর ভূ-ত্বকের বর্তমান 'প্লেট'গুলির অবস্থান ও তাদের গতির দিক দেখানো হয়েছে।

(geological) বয়সে। স্কুলের ছাত্রেরাও জানে যে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আনটার্কটিকা একসাথে যুক্ত থেকে ত্রিশ কোটি বছর আগে গঠন করেছিল এক বিশাল গণ্ডোয়ানা

মহাদেশ। এই মহাদেশ পরে ভেঙ্গে যায়—আণ্টর্কটিকা কিছু দক্ষিণে নামতে শুরু করে, অস্ট্রেলিয়া পূর্ব দিকে। আফ্রিকা ও দঃ আমেরিকা পশ্চিমে ও ভারত উত্তর পূর্বে (চিত্র ৪.১)।

ভারত ও সোভিয়েট-চীনের (সংক্ষেপে ইউরেশিয়ার) মাঝে যে বিশাল সমুদ্র ছিল—তার নাম টেথিস্। ভারতের এই প্রধানতঃ উত্তরমুখী অগ্রসরের (বছরে ৩ থেকে ৬ সেন্টিমিটার) চাপে ঐ টেথিস সমুদ্র-তলের পলল শিলীভূত হয়ে উঁচু ভাঁজ পর্বতের সৃষ্টি করে যা বর্তমানে হিমালয়-আল্পসীয় পর্বতশ্রেণী হিসাবে বিরাজমান। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টেথিস সমুদ্র এবং তার তল আজ অবলুপ্ত। সমুদ্রতলের ক্রমাগত বিবর্তন ঘটছে এ ভাবে এবং খুব পুরানো সমুদ্রতল আর দেখা যায় না।

সমুদ্রতলের রূপরেখা

সমুদ্র তল সম্পর্কে মূলতঃ চারটে তথ্য বিশেষ ভাবে জানা গেছে।

[এক] মহাদেশের স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্রতল খুবই নূতন। ২০ কোটি বছরের বেশী পুরোনো পাথর সমুদ্র-তলে আজ আর নেই। কিন্তু মহাদেশের কোথাও কোথাও ৩৮০ কোটি বছরের পাথর পাওয়া গেছে যেমন, ভারতবর্ষে, গ্রীনল্যাণ্ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইত্যাদি।

[দুই] সমুদ্রতলে বিশ্বব্যাপী সংকীর্ণ শৈলশিরা বা 'রিজ' (ridge) এবং চওড়া উত্থান বা 'রাইজ্' (rise) দেখা যায়। মধ্য-আটলান্টিয় রাইজ এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (৪.১ নং চিত্র)। এটি এই মহাসমুদ্রকে উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। এর থেকে ক্রমাগত গলিত ব্যাসল্ট লাভা নির্গত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জমে নূতন সমুদ্রতল সৃষ্টি করছে। এবং দুই ধারের 'প্লেট' (Plate) বা ভূ-ত্বক খণ্ডকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এদের আবার সামগ্রিক অবলুপ্তি ঘটছে নিমজ্জমান 'সাবডাকৃশন্ জোন্' (Subduction zone) বা অবনমিত বলয়ে। এখানেও ভূ-ত্বক বছরে ৩-৬ সেন্টিমিটার বেগে গভীরে নেমে যাচ্ছে। ভূ-ত্বকের শক্ত পাথর এভাবে প্রায় ৩০ কিলোমিটার নীচে নেমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপে গলে বিলুপ্ত হয়ে

যায়। কোথাও কোথাও এই গলে যাওয়া পাথরের আয়তনের বিবৃদ্ধিতে সৃষ্ট হচ্ছে আগ্নেয়গিরি ও ঘটছে গলিত লাভার নির্গমন।

[তিন] সমুদ্র গভীরে মধ্য মহাসাগরীয় উত্থান-স্থলে (mid-oceanic rise) যে নূতন ভূ-পৃষ্ঠের নবজন্ম ঘটছে—তা অধিকাংশই ব্যাসণ্ট পাথরের। এই পাথরে থাকে অনেক চৌম্বক-জাতীয় মণিক, যেমন, ম্যাগনেটাইট্ ইত্যাদি। এরা ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রানুসারে উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের সমুদ্র গর্ভ-সঞ্জাত ভূ-ত্বকে দেখা যায় যে এই চৌম্বক-দিক উত্থান বা রাইজের দুই ধারে বরাবর একবার দক্ষিণমুখী এবং তার পাশেই উত্তরমুখী এবং আরও দূরে আবার দক্ষিণমুখী ইত্যাদি ক্রমিক। দুই পাড়েই এই একই ধরনের চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টির ক্রমিক এবং ধারাবাহিক রূপ দেখে ধরা হয় যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়েছিল বারবার বিপরীত ধর্ম নিয়ে। অর্থাৎ বর্তমান উত্তর মেরুর দিক দক্ষিণ মেরু হয়েছিল আবার তারও আগে উত্তর মেরু উত্তর মেরুতেই ছিল।

সুতরাং সমুদ্রতল গবেষণায় বেশ স্পষ্টভাবে জানা গেল যে ভূ-চৌম্বকত্বের বহুবার বিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সব চাইতে পুরানো সমুদ্রতলের বয়স হল মাত্র ২০ কোটি বছর কিন্তু পৃথিবীর বয়স ধারণা করা হয় ৪৬০ কোটি বছর। সুতরাং পৃথিবীর বিবর্তনে বহুবারই এই চৌম্বক মেরুর বিবর্তন ঘটেছিল এবং পৃথিবীতে বহু ধ্বংস, বিবর্তন ইত্যাদি ঘটিয়েছিল।

[চার] এই গবেষণায় আরও জানা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার গভীর খাদ আছে। যার পাশ দিয়ে ছড়িয়ে আছে আগ্নেয়গিরির মালা ও ভূ-কম্পনের কেন্দ্রস্থলগুলি। সমুদ্রতল খাদে বরাবর নেমে গিয়ে নীচের তাপে গলে উঠে আসে গলিত লাভার আকারে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে। এই অবলুপ্তির সাথে ঘটে আসছে নূতন সমুদ্র তলের সৃষ্টি 'মধ্যমহাসাগরীয় উত্থান' অঞ্চলে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র তলের এই সংহারের ফলেই হচ্ছে জাপান অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত ও বিশ্বব্যাপী ভূ-কম্পন। এই ঘটনাগুলি ৪.১ এবং ৪.২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।
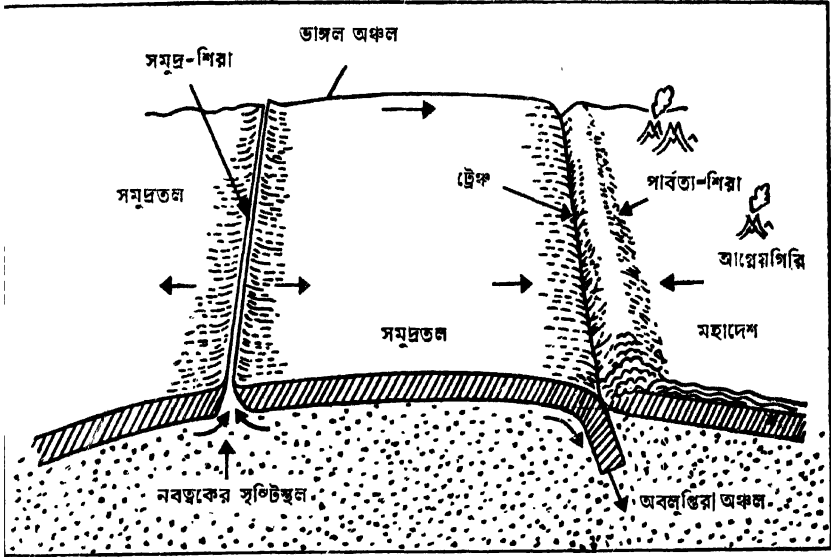
৪.২ : ভূ-ত্বকে সৃষ্টি ও অবলুপ্তির দৃশ্য ; সমুদ্র-শিরার যেমন সৃষ্টি হচ্ছে ত্বকের তেমনি লয় হচ্ছে ট্রেঞ্চে, যার পাশে জেগে উঠছে আগ্নেয়গিরি।

মহাদেশের সঞ্চরণ

যেমন বহু ভূ-ত্বকের 'প্লেট'গুলি আলাদা ভাবে ক্রমে সরে সরে যাচ্ছে এবং মহাসমুদ্রের মাঝে তেমন হচ্ছে তাদের সৃষ্টি এবং কোথাও তাদের ঘটছে অবলুপ্তি। এই 'প্লেট'গুলির উপর বসে আছে হাল্কা পাথরে গঠিত মহাদেশীয় ভূ-খণ্ড। ফলে প্লেট চলার সাথে মহাদেশগুলি তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা বাহক প্লেটে চড়ে চলেছে।

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, প্রাগৈতিহাসিক চৌম্বকত্ব, আবহাওয়া এবং জৈব বিবর্তনের ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসন্ধান করে প্রাচীন পৃথিবীর ভূ-খণ্ড

ও সমুদ্রের বিন্যাসের রূপরেখা জানতে পারা গেছে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অনেক কিছু ধারণা করা যাচ্ছে।
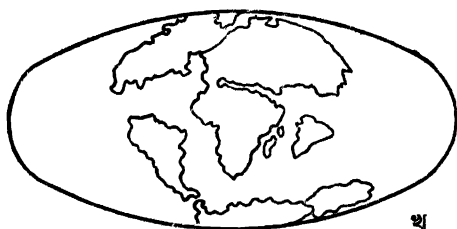
৪·৩ (ক) কুড়ি কোটি বছর আগেকার পৃথিবী পৃষ্ঠে বিস্তৃত লরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানা-এর মাঝে বিস্তৃত টেথিস সাগর।
(খ) সাড়ে ছ' কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর রূপ; উত্তর-পূর্বমুখী চলমান ভারত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু উত্তরে তখনও টেথিস সমুদ্র বিরাজমান।
(গ) চিরপরিচিত পৃথিবীর বর্তমান সুপ্রিয় রূপ।

ধারণা এখন স্পষ্ট যে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে একটি বিশাল মহাদেশ (Super-continent) ছিল যার নাম রাখা হয়েছে 'প্যাঙ্গিয়া' (Pangaea) এবং বিশ্বব্যাপী একটি মহাসমুদ্র, 'প্যান্থালাসা' (Panthalassa)। কয়েক কোটি বছর পরে এই মহাদেশ ভাঙ্গতে শুরু করল যার এক অংশ হল 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' (মধ্য-ভারতের 'গণ্ড' জায়গার নামানুসারে) যাতে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, আনটার্কটিকা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। এবং আর এক অংশ হল 'লরেশিয়া'—যাতে ছিল ইউরেশিয়া (ইউরোপ-এশীয় ভূ-খণ্ড), গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকা, এদের মাঝে সৃষ্ট হল 'টেথিস' (Tethys) সাগর (চিত্র নং ৪·৩)।

দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা এর পরে ভেঙ্গে সরে গেল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড

থেকে। এর ফলে এদের মাঝখানে সৃষ্ট হল দঃ আটলান্টিক মহাসাগর। প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে এই আটলান্টিকের বিস্তার ঘটে উত্তর দিকে এবং অস্ট্রেলিয়া সরে যেতে থাকে আনটার্কটিকা থেকে। ভারতও ছিন্ন হয়ে ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে এশীয় ভূ-খণ্ডের দিকে।

এর পরে ক্রমে ভারতের চাপে মধ্যবর্তী টেথিসের বিলুপ্তি ঘটে এবং উত্তুংগ হিমালয় জন্ম নেয়। এই চাপে হিমালয় আজও উঠছে; এভারেস্ট শীর্ষেরও হচ্ছে ক্রমোন্নতি।

এবার ভবিষ্যৎ সমুদ্রের রূপরেখা দেখা যাক।

আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পরে আটলান্টিক মহাসাগর আরও অনেক চওড়া হবে এবং ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগর সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। অস্ট্রেলিয়া উত্তরে এগুবে। আরব অন্তরীপ সরে এসে বাকী এশীয়-ভূখণ্ডের সাথে জুড়ে যাবে অর্থাৎ পারশ্য উপসাগর নিশ্চিহ্ন হবে আর লোহিত সাগর অনেক চওড়া হবে। ভূ-মধ্যসাগর ছোট হ্রদে পরিণত হবে এবং পূর্ব-আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল (বর্তমান ইথিওপিয়া, সোমালি ইত্যাদি) আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য এক আলাদা দেশের সৃষ্টি করবে।

সমুদ্রতলে ভূ-চৌম্বকত্বের পরিবর্তনের ছাপ

মধ্যমহাসাগরীয় পর্বতমালার (Mid-oceanic ridge)-এর কথা আগেই বলেছি। এরা প্রায় ৪০,০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এদের মাথা বরাবর ফাটল থাকে, যেখানে প্রায়শঃই সংঘটিত হয় অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূকম্পন। এর দুইপাশ ক্রমে দুদিকে সরে যেতে থাকে এবং চওড়া ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে গলিত পাথর যা ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত শিলায় পরিবর্তিত হয়; এইভাবে নূতন সমুদ্রতল ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট হয়। এই গলিত শিলার মধ্যে যে চৌম্বক পদার্থগুলি থাকে তারা ভূ-চৌম্বকক্ষেত্র অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বালম্বি দাঁড়ায়। যেন দুইটি চৌম্বক ফিতার মত পাথরের সার শৈলশিরা-এর দুইপাশ ধরে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের হঠাৎ পরিবর্তন (বিপরীত দিকে) ঘটলে ঐ নব সৃষ্ট গলিত প্রস্তরের মধ্যে চৌম্বক

কণাগুলিও বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে যায়। মহাসাগরের তলে পর পর এই রকম বিপরীত দিকে দাঁড়ান চৌম্বককণার গবেষণা করে জানা গেছে যে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের বহুবার বিবর্তন ঘটেছে। উত্তর হয়েছে দক্ষিণ, দক্ষিণ হয়েছে উত্তর। অবশ্য এই ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন কখনও সহসা কয়েকদিনে ঘটতে পারে, কখনও বা কয়েক হাজার বছর ধরে ঘটতে পারে। আটল্যান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নীচে এই ধরনের চৌম্বক ফিতার গবেষণায় ভূত্বকের সৃষ্টি ও লয়ের অনেক তথ্য জানা গেছে। এই ধরনের মহাসাগরীয় শৈলশিরার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে East pacific rise এবং আটল্যান্টিকে মিড আটল্যান্টিক রীজ (mid-atlantic ridge), ভারত মহাসাগরে কার্লসবার্গ রীজ (Carlsburgh ridge) প্রধান। এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে বছরে ১৫,০০০ কিলোমিটার ব্যাপী শৈলশিরা থেকে বছরে ১৬ সেন্টিমিটার ভূত্বকের সৃষ্টি হচ্ছে এবং গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের তল ১০ কোটি বছরে সৃষ্ট হতে পারে। সাধারণতঃ এই সমুদ্রতলের সৃষ্টি বছরে ২ সেন্টিমিটার হতে ১৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। এই শৈলশিরাগুলি কোথাও কোথাও সমান্তরাল চ্যুতির দ্বারা বিখণ্ডিত হয়ে থাকে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত ও আটল্যান্টিক মহাসাগরে এইসব চ্যুতিগুলির ঠিকানা খুব স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে। মহাদেশের মধ্যেও কখনো এই চ্যুতি প্রবেশ করে এর দুইপাশের অংশকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দিতে পারে, যেমন আফ্রিকা ও আরবের মধ্যে এই ধরনের চ্যুতি লোহিত সাগরের সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানে ইথিওপিয়াকে আফ্রিকা হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে।

ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নক্শা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে ভূত্বক শক্ত প্লেটের (plate) মত এবং এর একধারে যেমন সৃষ্ট হচ্ছে সমুদ্রতল অপরদিকে মহাদেশের কাছাকাছি বা অভ্যন্তরে ইহা ক্রমে ভূ-অভ্যন্তরে নেমে গিয়ে তাপে গলিত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে। এই কারণে সদাসৃষ্ট সমুদ্রতলের বয়স কোথাও ২০ কোটি বৎসরের বেশী পাওয়া যায় না এবং বর্তমান কোন সমুদ্রেই ৮ কোটি বছরের বেশী পুরোনো পলল খুব কমই দেখা যায়। কারণ বেশী পুরোনো পলল সমুদ্র তল কর্তৃক বাহিত হয়ে

মহাদেশের উপকূলে পুঞ্জীভূত হয়ে যায়। এমনই পুঞ্জীভূত পলল স্তরে গঠিত হয়েছে সুউচ্চ হিমালয়-আল্পসীয় ভাঁজ পর্বতমালা যার তলে অবনমিত ভূত্বকের হচ্ছে ক্রমবিলুপ্তি। এই বিলোপের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬ সেন্টিমিটার।

এইভাবে আমরা জানি যে ১৫ কোটি বছরের আগে আটল্যান্টিক মহাসাগরের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু একটি বিশাল পুরোণো সমুদ্র ছিল, অন্যদিক বরাবর যার পলল থেকে সৃষ্ট হয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্যালিডোনিয়ান ও আপালেশিয়ান পর্বতমালা।

বর্তমান ইউর্যাল ছিল একটি আড়াআড়ি সমুদ্র যা সাইবেরিয়াকে পশ্চিম রাশিয়া থেকে বিছিন্ন করে রেখেছিল এবং ক্রমে ঐ দুই স্থলভূমির পরস্পর অভিমুখী অভিযানে মধ্যবর্তী পললের ভাঁজে পর্বতের সৃষ্টিতে বর্তমান ইউর্যালের জন্ম হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের চারিপাশে সমুদ্রতলের ভূ-অভ্যন্তরে ক্রম অবলুপ্তির ফলে সৃষ্ট হয়েছে আগ্নেয় গিরিমালা বা 'রিংগ অব ফায়ার' (Ring of fire)।

পঞ্চম পর্ব

সমুদ্রে মণিক সম্পদ

সূচনা

দেশে মহাদেশে সভ্যতা ও শিল্পের ক্রম বিকাশের প্রয়োজনে খনিজ সম্পদের ঘটেছে ক্রমিক অবলুপ্তি এবং শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে নিত্যনূতন তাগিদায় মানুষের দৃষ্টি নেমেছে এখন সমুদ্রতলে খনিজ সম্পদের দিকে।

মানুষ সমুদ্র থেকে লবণ সংগ্রহ করেছে প্রায় আদিম যুগ থেকে। সমুদ্র জলের লবণত্ব ৩.৫ শতাংশ, অর্থাৎ এক ঘন মাইল সমুদ্র জলে ১৬.৬ কোটি টন লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। এবং সমুদ্র জলের লবণ দিয়ে মহাদেশগুলিকে ৫০০ ফুটের লবণস্তর দ্বারা ঢেকে দেওয়া সম্ভব। এই লবণের বেশীর ভাগ সোডিয়াম ও ক্লোরিণ-যুক্ত লবণ বাকী অন্যান্য
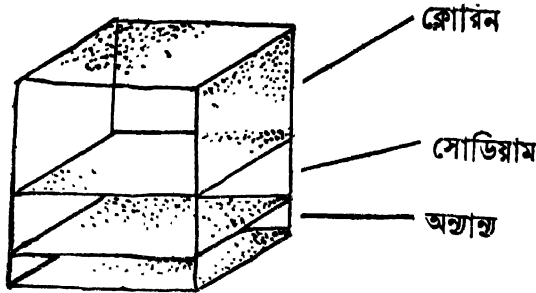
৫.১ সমুদ্র লবণের মধ্যে সোডিয়াম, ক্লোরিণ ও অন্যান্যের পরিমাণ।

প্রকারের দ্রব্য (চিত্র নং ৫.১) সমুদ্রজল থেকে নুন ছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম, ব্রেমিন সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া সমুদ্রতটে পাওয়া যায় নানা ধরনের দামী মণিক যেমন, ক্যাসিটেরাইট (টিন-এর জন্যে), ইলমেনাইট্ (টাইটেনিয়াম), মোনাজাইট্ (থোরিয়াম) ম্যাগনেটাইট্ (লোহা), রুটিল এবং লিউকোক্সিন্ (টাইটেনিয়ম), জির্কন্ (জারকোনিয়াম), ক্রোমাইট (ক্রোমিয়াম), শিলাইট ও উলফ্রামাইট্

(টাংস্টেন), কায়েনাইট, কায়েনাইট ও গার্নেট, সোনার দানা, প্লাটিনাম, হীরে ইত্যাদির টুকরো। এই ধরণের মণিক সমৃদ্ধ পলিজ পাওয়া যায় ভারতের দক্ষিণ উপকূলে, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ পশ্চিম ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি জায়গায়, যার বর্ণনা পরে দেব। প্রধান হাল্কামণিক (জির্কন, কায়েনাইট, রুটিল, মোনাজাইট ইত্যাদি) ও অন্যান্য উপকূলবর্তী মণিক-সম্পদের চিত্র নীচে দেওয়া হল (চিত্র ৫·২)। সমুদ্র তটভূমি থেকে আরও গভীরের দিকে এগুলে ক্রমে পাওয়া যায় তেল, গ্যাস, ফসফেট এবং ম্যাঙ্গানীজের নুড়ি বা নডিউল।

৫·২ : সমুদ্র উপকূলে মণিক সম্পদ।

সমুদ্র তল খুবই অসমান। মহাদেশগুলির ধার বরাবর থাকে অগভীর মহীসোপান, যা প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নীচে প্রসারিত। এরই উপরে থাকে পলিজ মণিক এবং ফসফোরাইট। এর পরেই আছে মহাদেশীয় ঢাল যার পাদদেশ থেকে শুরু হয় মহাসাগরীয় ত্বক। এই ত্বক সাধারণতঃ ভারী ব্যসল্ট পাথরে গঠিত এবং এরই উপরে স্থাপিত মহাদেশীয় শিলা, যা হাল্কা গ্রানাইট জাতীয় পাথরে গঠিত।

ভারতের উপকূলে মণিক সম্পদ ঃ কৃষ্ণ বালুকা

ভারতের সমুদ্রতটের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯২৮০ কিলোমিটার। এতে অসংখ নদীনালা দেশ অভ্যন্তর থেকে মণিক বহন করে এনে ফেলছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এইভাবে বাহিত এবং সমুদ্র তরঙ্গদ্বারা সমৃদ্ধ 'কৃষ্ণ বালুকা' কন্যা কুমারীকা থেকে মালাবার উপকূল বরাবর বিস্তৃত হয়ে আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে কুইলনের কাছাকাছি অনেক জায়গায় এই কালো বালুকা থেকে মণিক সংগ্রহের জন্যে খনির কাজ বহুকাল ধরে চলে আসছে। এই কালো বালিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ইলমেনাইট্, রুটিল, জারকন এবং মোনাজাইট। এই কালো বালু আছে মহারাষ্ট্রের উপকূলে ; এ পাওয়া যায় পূর্ব উপকূলে তামিলনাড়ুর তিনাভেলী, রামনাদ এবং তাঞ্জোর, অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপতনম্, ওয়ালটেয়ার, ইয়রাদা, ভিমুনিপত্নম্ এবং উড়িষ্যার গঞ্জাম এবং ব্রাহ্মণী নদীর মুখে হুইলার দ্বীপে।

আগেই বলেছি কালো বালুতে আছে মোনাজাইট যা থেকে পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম। এবং এ থেকে ভারত মোট ২০ লক্ষ টন মোনাজাইট সংগ্রহ করতে পারে।

চুণ সমৃদ্ধ বালি, প্রবাল এবং শামুকের খোলা কেরালা উপকূল থেকে ও কচ্ছ উপসাগর থেকে আহৃত হয়ে থাকে সিমেন্ট তৈরীর জন্যে। এ ধরনের প্রবাল ও শামুকের খোলা সমৃদ্ধ চুনা পাথর পাওয়া যায় আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, মান্নার ও পক্ প্রণালীর মাঝে অগভীর জলে। এগুলি সিমেন্ট তৈরীর পক্ষে খুব উপযুক্ত।

অন্যান্য স্থানের বালুকা

আগেই বলেছি পৃথিবীর অনেক উপকূলেই এই ধরনের কালো বালি পাওয়া যায় (চিত্র নং ৫'২)। কোথায় এবং কী ধরনের মণিক উপাদান (প্রধান) এতে পাওয়া যায় তার নীচে দেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়া (রুটিল্, জারকন্, স্বর্ণ এবং ইলমেনাইট্)
ব্রেজিল (মোনাজাইট্ এবং ইলমেনাইট্)
নরওয়ে এবং জাপান (ম্যাগনেটাইট্)

মালয়েশিয়া (উলফ্রামাইট্ এবং ক্যসিটেরাইট্)
দক্ষিণ আফ্রিকা (ক্রোমাইট, কাঁচা সোনা, হীরা)
আলাস্কা, (সোনা এবং প্লাটিনাম)
কানাডা (" ")
রাশিয়া (" ")

দক্ষিণ অফ্রিকা, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র (ইলমেনাইট ও রুটিল)

এ ছাড়া এই ধরণের জারকন, গারনেট, মোনাজাইট ও রুটিল সমৃদ্ধ বালি পাওয়া যায় মোজাম্বিক, সেনেগাল, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং শ্রীলঙ্কার উপকূলে।

এই সব উপকূলে খনির কাজ চলেছে ভারত ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকায় (কাঁচা সোনা, হীরে, ক্রোমাইট ইত্যাদি), যুক্তরাষ্ট্রে (সোনা, প্লাটিনাম ও অন্যান্য মণিক), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তাইওয়ানে (টিন) এবং অষ্ট্রেলিয়ায় (মোনাজাইট, জারকন, ইলমেনাইট ও রুটিল)।

৫৩ : ফস্‌ফোরাইট সমৃদ্ধ সমুদ্রাঞ্চল।

ফস্‌ফোরাইট

১০০০ মিটারের কম গভীরে মহীসোপানের ধারে ফস্‌ফোরাইট পাওয়া

যায়। এর প্রধান মণিক হল ফ্লোর-এপেটাইট $[Ca_{10} (Po_4. Co_3)F_{32}]$ যাতে কিছু কার্বনেট থাকে। এটি ফসফেট সার উৎপাদনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রশান্ত মহাসাগর ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরের মহাদেশোপকূলবর্তী ও নিমজ্জিত পার্বত্যাঞ্চলে ফস্‌ফোরাইট সমৃদ্ধ জায়গাগুলি ৫·৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

তেল এবং গ্যাস

আটলান্টিক, উত্তর সাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে তেল এবং গ্যাস। আজকের দিনে পৃথিবীর মোট তেল এবং গ্যাস উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ আসে সমুদ্রতল থেকে। পৃথিবীতে যে প্রতিদিন মোট ৮৭০ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয় তার ১৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৪০ লক্ষ ব্যারেল উৎপন্ন হয় সমুদ্রতল থেকে। এ জন্যে সমুদ্রেই আছে ছয় হাজার কূপ।

ভারতবর্ষ আরব সাগরের কাম্বে অঞ্চল থেকে প্রতিদিন ১৪০,০০০ ব্যারেল তেল আহরণ করছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা এবং আন্দামানের কাছে বঙ্গোপসাগরে এই ধরনের তেল উৎপাদনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

গভীর সমুদ্রের সম্পদ ঃ ম্যাঙ্গানীজ নডিউল (বা নডুল)

বিশেষ ধরনের ধাতু-সমৃদ্ধ নুড়ি পাথর (nodule) সমুদ্রের তলে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে থাকতে দেখা যায়। এগুলি প্রধানতঃ ম্যাঙ্গানীজ এবং লৌহ ঘটিত। তাদের সাথে মিশ্রিত থাকে কিছু পরিমাণ নিকেল, তামা ও কোবাল্ট—যাদের মোট পরিমাণ ১ থেকে ৪ শতাংশ মাত্র। এ ছাড়াও থাকে সামান্য পরিমাণে দস্তা, সীসা, মলিবডেনাম্‌, ভ্যানাডিয়াম্‌, সোনা, প্লাটিনাম, টাইটেনিয়াম, জারকোনিয়াম, রূপা, ফসফরাস, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই সব মূল্যবান ধাতুগুলির নিষ্কাশন ম্যাঙ্গানীজ নডুল থেকে সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে এগুলি প্রধানতঃ নিকেল তামা ও কোবাল্টের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই ম্যাঙ্গানীজ নুড়িগুলির অন্তঃস্থলে সাধারণতঃ একটি বিজাতীয় পদার্থ দেখা যায়। যাকে ঘিরে লৌহ-ম্যাঙ্গানীজের মণিক স্তর জমে ওঠে
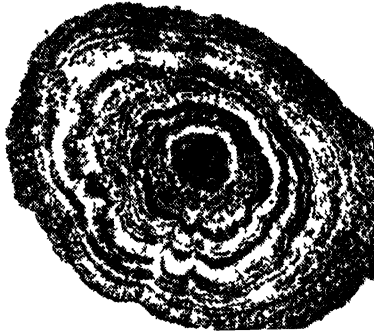
৫ ৪ : একটি ম্যাঙ্গানীজ নডিউলের প্রস্থচ্ছেদ-দৃশ্যে এর ক্রমিক স্তরগুলি দেখা যাচ্ছে।

(চিত্র নং ৫.৪) ঐ অন্তস্থল বা কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াসে) থাকতে পারে হাঙ্গরের দাঁত, বালি বা কোনো পাথরের দানা, কোনো মৃত জীবের শক্ত অংশ ইত্যাদি। আকৃতিগত ভাবে এই নুড়িগুলি বিভিন্ন রকমের আলুর মত দেখায় যাদের চেহারা কোথাও গোলাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, বহু ভূজাকৃতি কখনও বা ছুঁচালো (চিত্র নং ৩২)। কোনোটা দেখতে গোল আলুর মত কখনও বা চাকতির মত, কখনও আঙ্গুরের গুচ্ছের মত, কখনও বা হ্যামবার্গারের মত। নুড়িগুলির রং কখনও কালাচে, কখনও তামাটে। কালাচেগুলি ম্যাঙ্গানীজ সমৃদ্ধ এবং তামাটেগুলি লৌহ সমৃদ্ধ। ভারত মহাসাগর থেকে আহৃত এই ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির সাধারণ ব্যাস ৩ থেকে ৬ সেন্টিমিটার। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের ঢালের অদূরবর্তী স্থানে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় আলুর মত নুড়ি পাওয়া গিয়েছে।

১৮৭৩-৭৬ সালে চ্যালেঞ্জার অভিযানে এই নুড়িগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। নুড়িগুলির মোটামুটি রাসায়নিক গঠন নীচের ছকে দেওয়া হল।

ধাতু		শতাংশ
ম্যাঙ্গানীজ	... ...	১৫'১৭
লৌহ	... ...	১৫'৬০
নিকেল	... ...	০'৪৯
তামা	... ...	০'২৫
কোবাল্ট	... ...	০'২৯
দস্তা	... ...	০'০৭১
মলিবডেনাম	... ...	০'০৪১

উৎপত্তি

এই ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির উৎপত্তি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। জানা গেছে যে কোনো সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত বা নিমজ্জিত মহাসাগরীয় শৈলশিরা থেকে উৎসারিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে জলের প্রক্রিয়ায় লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল ও তামা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলে যেখানে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন আছে এমন জায়গায় কোনো প্রস্তর খণ্ডের বা হাঙ্গরের দাঁতের চারিপাশে জমা হতে থাকে। যেমন মানুষের পেটে 'স্টোন' বা 'ক্যাল্‌কুলি'র সৃষ্টি হয়। এই ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির মধ্যে টোডোরো-কাইট্ (Todorokite) এবং ডেল্‌টা ম্যাঙ্গানীজ ডায়ক্সাইড্ (δ-MnO_2) দুইটি প্রধান মনিক। টোডোরোকাইট বেশী থাকলে নিকেল, তামা এবং দস্তা সাধারণতঃ বেশী থাকে। এই জন্য নুড়িগুলিতে প্রাথমিক ভাবে টোডোরোকাইট নির্ধারণ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ নুড়িগুলির মূল্য নিরূপিত হয় তাদের তামা, দস্তা, কোবাল্ট ও নিকেলের পরিমাণের উপর।

ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে গভীর সমুদ্রে নিকেল, দস্তা, তামা ও কোবাল্ট সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ নডিউলের বিস্তারের নক্সা দেওয়া হয়েছে ৫'৫ নং চিত্রে।

৫'৫ : বিভিন্ন স্থানে গভীর সমুদ্রে নিকেল-দস্তা-তামা-কোবাল্ট-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ নডিউল।

মোট ভাণ্ডার

পৃথিবীর সমুদ্রতলে এই নুড়ির মোট পরিমাণ ১'৭ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন টন বলে ধরা হয়। মূর এবং ক্রুকশ্যঙ্কের মতে এই ১'৭ ট্রিলিয়নের ভাগ প্রশান্ত, ভারত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রে নীম্নোক্তরূপ :

প্রশান্ত মহাসাগর—১'৫ ট্রিলিয়ন টন
ভারত " —০'১৫ " "
আটলান্টিক " —০'০১৫ " "
মোট—১'৭ " " (প্রায়)

শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের নুড়িতে নিকেলের পরিমাণ ৩৫৮০০ কোটি টন। বছরে ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন করতে পারে এমন প্রায় একশ জায়গা

ঠিক করা গেছে যেখানে খনন ও উৎপাদন করা শুরু করা যাবে এ শতাব্দীর শেষপাদে।

অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত খনিজ

সমুদ্রের যে সকল অঞ্চলে তামা, দস্তা, সীসা ইত্যাদি ধাতুসমৃদ্ধ পলল পাওয়া যায় তাদের মধ্যে লোহিত সাগর, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে গেলাপেগোস ও আটলান্টিস (দুই) অঞ্চল বিশেষভাবে ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত। আটলান্টিস দুই অঞ্চলেই ২৩৩ কোটি ডলার মূল্যের (১৯৭২ সালের হিসাবে) তামা দস্তা ও রূপা পাওয়া যাবে। তার মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ : দস্তা—২৫ লক্ষ টন; তামা—২৯ লক্ষ টন ও রূপা ৯ হাজার টন। গেলাপেগোস অঞ্চলে মোট গন্ধক মিশ্রিত ধাতুর পরিমাণ ২৫০ লক্ষ টন।

ষষ্ঠ পর্ব

যুগের দাবী

যুগের খাদ্য প্রয়োজনে সমুদ্র ঃ

এ শতাব্দীর শেষপাদে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে দাড়াবে এবং তাদের আহারের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন হবে প্রায় ২০৪ কোটি মেট্রিক টন। অবশ্য তৎসঙ্গে বাড়বে অন্যান্য চাহিদা—যেমন, শক্তি, শিল্প, বাসস্থান ইত্যাদি। জমিতে খাদ্যোৎপাদন তত পরিমাণে বাড়বে না কারণ জমির উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত। খাদ্য ছাড়া স্থলে উৎপাদিত শক্তির উৎস—যথা, তেল, কয়লা বা অন্য জ্বালানী প্রভৃতির পরিমাণও খুব সীমিত। এ জন্যে সমুদ্রে শক্তি ও খাদ্য অন্বেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রে আছে অগুণতি প্রকারের জীবজন্তু ও গাছপালা। এতে আছে প্রায় ১৫ হাজার ধরনের মাছ এবং ৬০ হাজার ধরনের শামুক। এই মাছ ও জন্তুরা বেঁচে থাকে সমুদ্রের প্লাঙ্কটন্ খেয়ে। সমুদ্রের সব্জি ও ছোট জীব খেয়ে বড় হয়ে ওঠে বৃহদাকৃতির মাছেরা। সামুদ্রিক গাছেরা জলত্বক থেকে ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সাধারণতঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। অন্য জীব জন্তুদের সমুদ্রের খুব গভীরতা পর্যন্ত দেখা যায়।

পৃথিবীর স্থলভাগের প্রাণীর তুলনায় সমুদ্রে আছে তার ৫-১০ গুণ বেশী পরিমাণ প্রাণী। প্রতি বছরে স্থলে উদ্ভিদ সহ জীবের মোট উৎপাদন ঘটে $৪৭\cdot৬ \times ১০^{৯}$ মেটিক টন এবং লেক ও নদীতে এই জীবের মোট উৎপাদন বছরে $০\cdot৬ \times ১০^{৯}$ মেট্রিক টন।

এবার দেখা যাক, মোট কত মাছ ধরা হয় ঃ খোলা গভীর সমুদ্র থেকে বছরে $১\cdot৬ \times ১০^{৬}$ মেট্রিকটন মাছ ধরা হয় এবং উপকূল থেকে ধরা হয় বছরে $১\cdot২ \times ১০^{৮}$ মেট্রিক টনের মাছ।

সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। ১৯০২ সালে স্টকহোল্‌মে একটি আন্তর্জাতিক কাউন্সিল গঠিত হল বাল্টিক, উত্তর সাগর, নরওয়ে সাগর, বার্নেট সাগর ও আইরিশ সাগরে মাছ ধরার নিয়ম-কানুন গঠনের জন্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কারিগরী বিদ্যা অনেক বেশী উন্নত হল এবং স্থলে চাষ উৎপাদনের চাইতে জলে মাছ উৎপাদনের হার অনেক বেশী বৃদ্ধি পেল। ১৯৬৮ সালেই ধরা মাছের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি টন। সমুদ্র গবেষণার ফলে মানুষ আরও দৃঢ়তার সাথে সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া, পরিবেশ ইত্যাদি জানতে পেরেছে এবং শিকারের কুশলতা অর্জন করেছে। এটা নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে সমপরিমাণ অঞ্চল ব্যাপী জল ও স্থলের মধ্যে জলেই বেশী পরিমাণ মাছ ইত্যাদির প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব; তুলনায় স্থলের গরু, ভেড়া ইত্যাদির মোট প্রোটিন উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। আগেই বলেছি প্রায় ৫ থেকে ১০ গুণ কম।

আজকাল এই মৎস্য প্রোটিনকে গন্ধ বিহীন পাউডারে তৈরী করে বিক্রী করা হয়। এই গুঁড়ো যে কোনো খাদ্যে প্রয়োজনমত যোগ করে ঐ খাদ্যের প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। একুয়াকালচার করে যেমন সমুদ্রের মুক্তা ট্যাঙ্কে জমানো সম্ভব তেমনি সমুদ্রতলের প্রোটিন ও নানা প্রয়োজনীয় ধাতু সমৃদ্ধ শ্যাওলা বা সব্জী একুয়াকালচারে তৈরীর চেষ্টা চলছে।

সমুদ্র আইন

সমুদ্রের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে মানুষ যত বেশী অবহিত হচ্ছে তত বেশী তার অধিকার ও বণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের সূত্রপাত ঘটছে। এই বিষয় রাষ্ট্রপুঞ্জে এবং অন্যান্য কন্‌ফারেন্সে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল পর্যন্ত কোনো দেশের সমুদ্রের উপর অধিকার তার তটভূমি থেকে ৩ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯৫২ সালে সেটা বাড়াবার চেষ্টা হল ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

১৯৫৮ সালে জেনেভা কন্‌ফারেন্সে ঠিক হল যে তটভূমি থেকে ২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সান্নিহিত দেশের অধিকার থাকবে। এই বছরই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের কন্‌ফারেন্স অন্ 'দি ল' অফ দি সী (UNCLOS বা আন্‌ক্লোজ) হয়। তার দু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় কনফারেন্স হয় তাতে ৮৮টি দেশ যোগ দিয়েছিল।

১৯৭০ সালে ৭৭টি দেশের গোষ্ঠী (যার মধ্যে ভারত অন্যতম) রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পর্ষদে ঘোষণা করে যে দেশের অধিকার ক্ষেত্রের বাইরে প্রসারিত মহাসমুদ্র বিবেচিত হবে "মানব জাতির সার্বজনীন উত্তরাধিকার" (The Common Heritage of Mankind) হিসেবে।

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্‌ক্লোজ (UNCLOS)-এ স্বীকৃত হয় যে সকল দেশই সমুদ্রের ১২ নটিক্যাল মাইল (অর্থাৎ মোটামুটি ২২ কিলোমিটার) পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব লাভ করবে। দেশগুলি ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আমদানী ও রপ্তানীর উপর শুল্কধার্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করবে। ১৯৮০ সালের আন্‌ক্লোজ্-এর সভায় বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ জন সভ্য যোগ দিয়েছিলেন।

বর্তমানে স্বীকৃত হয়েছে যে তটভূমি থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (বা ৩৭০ কিলোমিটার) পর্যন্ত সমুদ্র-তল সন্নিহিত দেশের আওতায় থাকবে, ঐ গভীরতায় সকল মণিক ও প্রাণী সম্পদ আহরণ করতে পারবে এবং অন্যদেশবাসীকে ঐ এলাকায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

১৯৬৯ সালে ভিয়েনার এক কনভেন্‌শনে যে চুক্তিবদ্ধতার আইন (Law of Treaties) পাস হয়, সব আন্তর্জাতিক চুক্তিই ঐ আইনের আওতাভুক্ত।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে জামাইকা দ্বীপে আলোচনায় উন্নতিশীল দেশগুলি নূতনভাবে সমুদ্র কনভেনশনের আইন (Law of Sea Convention) পাস করার জন্যে সহি সংগ্রহ শুরু করে। স্থির হয় একবছর পরে ৬০টা দেশের সম্মতি পাওয়া গেলে তবে রাষ্ট্রপুঞ্জকে এটা

মেনে নেবার জন্য চাপ দেওয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জামাইকা, ফিজি, জাম্বিয়া ও নামিবিয়া ছাড়া আর কোনো দেশের সই ওতে লিপিবদ্ধ হয় নি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলি সই দেবে।

এই কনভেনশনে প্রথম থেকেই বাধা দিয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ। এরা নিজেদের দেশের আইন কানুন খাটিয়ে মুক্ত সমুদ্রে আধিপত্য বজায় রাখতে চায় ১৯৫৮ সালের জেনিভা কন্‌ভেন্‌শন্‌ ধারা অনুসারে সমুদ্র আইন সৃষ্টি করে।

সমুদ্র কন্‌ভেন্‌শনের আইন পাস করানো নিয়ে তৃতীয় বিশ্বশক্তি বা উন্নতিশীল দেশগুলির সাথে উন্নত দেশগুলির গত ১১ বছর ধরে বিরোধ চলছে। এই সমুদ্র আইন পাস করানোর সাথে জড়িয়ে আছে নূতন পৃথিবীর আর্থিকরূপ (New world Economic Order)। এটা স্বীকৃত যে দেশের রাজনৈতিক সীমানার বাইরে গভীর সমুদ্র তলের ঐশ্বর্য হচ্ছে সকল জগৎবাসীর উপভোগ্য সমান উত্তরাধিকার (Common Heritage of Mankind) এবং কোনো দেশ বিশ্বজনের উপকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এই সম্পদ আহরণ করতে পারবে না। এই সূত্র ১৯৭৯ সালে স্বীকৃত চাঁদ ও অন্যান্য অপার্থিব-বিশ্ব-সম্পর্কিত চুক্তির মত। ঐ চুক্তির সাধারণ নাম Moon Treaty। এই চুক্তি বলে চাঁদের সকল ঐশ্বর্যকে পৃথিবীর সকল মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৮০ সালের আন্‌ক্লোজ-এর সভায় বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫০ জন সভ্য যোগ দিয়েছিলেন।

তৃতীয় আন্‌ক্লোজের অধিবেশনের প্রথম দিনেই ১১৮টা দেশ সই দেয়। এবং বর্তমানে স্বীকৃত হয়েছে যে তটভূমি থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (বা ৩৭০ কিলোমিটার) পর্যন্ত সমুদ্রতল সন্নিহিত দেশের আওতায় থাকবে, ঐ গভীরতায় সকল মণিক ও প্রাণী সম্পদ আহরণ করতে পারবে এবং অন্যদেশকে ঐ এলাকায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

ছেচল্লিশ দেশের সভ্য-বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল অধিকারিক (International Seabed Authority) এবং তার সহযোগী সংস্থা 'এন্টারপ্রাইজ' গভীর সমুদ্রের ঐশ্বর্য খনন ও মৎস্য-চাষের আইনের দিকগুলি দেখাশুনা করে। অনেকগুলি দেশ সমুদ্রে খনিজ উত্তোলনের নিয়ম কানুন স্থির করেছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে গভীর সমুদ্রে খনিজ উত্তোলনের কাজে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন আশু স্থিরীকরণ বিশেষ প্রয়োজন।

গভীর সমুদ্রে বিশালাকৃতির খনির চেহারা প্রথম দেখা দেবে হাওয়াই ও মেক্সিকোর অন্তর্বর্তী ক্ল্যারিওন ক্লিপার ভঙ্গিল অঞ্চলে (Clarion-Clipper Fracture Zone)। এখানে ছয় থেকে দশ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী অঞ্চলে ঘন অবস্থায় ম্যাঙ্গানীজ নডিউল আছে। ডিপ্ সী ভেঞ্চার্স ইনক্ (Deep Sea Ventures Inc.) নামক এক আমেরিকান সংস্থা এখানে ম্যাঙ্গানীজ নডিউল উত্তোলনের সর্বস্বত্ব দাবী করছে। সমুদ্রে খনন কার্যের বর্তমানে নানা অসুবিধার কথা বিবেচনা করলে এ প্রতীয়মান হয় যে সমুদ্রে খনির স্বাভাবিক কাজ দেখবার জন্যে আমাদের নিদেন পক্ষে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ঢেউ ও জলস্রোত থেকে শক্তি

ক্রমবর্ধমান শিল্পের চাহিদায় স্থলে শক্তির সীমিত পরিমাণের উৎস, যথা—তেল, কয়লা ও অন্য জ্বালানী যাচ্ছে দ্রুত ফুরিয়ে। এর জন্য সমুদ্রতলে তেল ছাড়াও অন্য শক্তির উৎসের সন্ধান চলছে।

বায়ুপ্রবাহের ফলে সমুদ্রে যেমন ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় জলস্রোতেরও গতি নির্ধারিত হয়। সমুদ্রে মাছধরা ছাড়া এই জলস্রোতকে কাজে লাগানো যায় সমুদ্রতলে চাষ বাস ও শক্তি তৈরীর কাজে। চাঁদের অভিকর্ষণের ফলে সমুদ্রে দিনে দুবার করে জোয়ার ভাঁটা চলে এবং সমুদ্রতলে চলে জলস্রোত। এই জলস্রোতকেও কাজে লাগানো যেতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের কাজে এবং এ ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রথমে শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে।

সমুদ্রতলে তাপমাত্রার তারতম্যকে ব্যবহার করা যেতে পারে তাপশক্তি আহরণে। সমুদ্রত্বক ও তার ৪৫০ মিটার নীচের জলের মধ্যে তাপের পার্থক্য থাকে প্রায় ১৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। যে তাপ-তারতম্য ঘটিত পদ্ধতিতে রিফ্রিজারেটর চলে তার উল্টো পদ্ধতিতে এই তারতম্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। যদি এইভাবে সমুদ্র থেকে শক্তি আহরণ যথেষ্ট-ভাবে করা যায় তবে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সব শক্তির চাহিদা এভাবে মেটানো সম্ভব।

সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ ও সভ্যতার সংকট

বিশাল নগরগুলির অধিকাংশই সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিতে উপকূল অঞ্চল ক্রমেই ঘন বসতিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নগরের বৃহৎ শিল্প-উদ্ভূত আবর্জনা রাসায়নিক দ্রব্য ও উষ্ণ জল সমুদ্রের জল ও তার পরিবেশকে দুষ্ট করে তুলেছে। এর ফলে ঘটেছে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ ও জীবজন্তুর বিনাশ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষাক্ত ধাতু এই সামুদ্রিক মাছদের শরীরে থেকে যায় এবং তা ক্রমে ঐ মাছ-খাওয়া জীবের দেহে, বিশেষতঃ মানুষের দেহে, চলে আসে।

এইভাবেই ভারী শিল্প হতে পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থের বহুলাংশ মাছের শরীরে জমা হয় এবং তা খেয়ে মানুষেরা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এমন কি মারা যায়। ১৯৫৩ সালে সংঘটিত এমনই এক রোগ প্রকোপ ঘটেছিল জাপানের মিনামাটা উপসাগরে। সেখানে কাপড় ও অন্যান্য রাসায়নিক কারখানা হতে যে ধাতু-সমৃদ্ধ তরল আবর্জনা নির্গত হয়ে মিনামাটা উপসাগরে পড়ত তাতে থাকত প্রচুর পরিমাণ পারদ (Mercury)। ওখানকার মাছেদের শরীরে তাই ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছিল এই বিষাক্ত ধাতু এবং ১৯৫৩ সালে হঠাৎ ঐ মাছ খেয়ে মিনামাটা ও নাগাটা শহরে কয়েক সহস্র লোক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং কয়েকজন মারা যায়।

সমুদ্রোপকূলের ভারী শিল্প ছাড়া বড় বড় তেলবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজও সমুদ্রদূষণের আর এক বড় কারণ। এগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তেল পড়ে জলে ভাসতে থাকে। এরা ফুটো হলে বা ধ্বংস পেলে ত কথাই নেই,

বহু মাইল ব্যাপী জলের উপর এক তেলের আস্তরণের সৃষ্টি হয় এবং উপরের হাওয়া বা অক্সিজেন না পেয়ে বা ঐ তেল খেয়ে লক্ষ লক্ষ মাছ একসঙ্গে মারা যায় ; অনেক সময় মাছেরা এ মৃত্যুর আগে দল বেঁধে ডাঙ্গায় উঠে পড়ে। ঐ মৃত মাছের চালান গিয়ে দূরের অজ্ঞ মানুষেরা অসুস্থ হয়। সমুদ্রতল থেকে তেল আহরণের সময় ঐ সকল কূপ থেকে তেল উঠেও সমুদ্রের জলের এ রকমের ক্ষতি করে।

আজ থেকে ৬০ বছর আগে গ্যাসোলিনে সীসা-মিশ্রিত টেট্রাইথাইল লেড-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং এরই মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিশাল জলাশয়ে বিষাক্ত সীসার পরিমাণ এগারোগুণ বেড়ে গেছে। পূর্বভারত, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশে মশা ও কীট মারার জন্যে ব্যবহৃত ডিডিটি (DDT) বঙ্গোপসাগরে জমে উঠেছে এবং সেই DDT হাওয়া ও সমুদ্রে তরঙ্গে পশ্চিমেও বহুদূর প্রসারিত হচ্ছে ; যার কিছু অংশ আফ্রিকার উপকূলের জলে পাওয়া গেছে।

সমুদ্রজলে পারমাণবিক পদার্থের ক্রমবিস্তার এক বিধ্বংসের সূচনা করছে। পৃথিবীর সমুদ্রের যে কোনো অঞ্চল থেকে ৫০ গ্যালন জল নিলে তাতে মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ ধরা পড়ে। সমসাময়িক কাল পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় সমুদ্রে মোট প্রায় ৬৫৪২ কিলোগ্রাম ক্ষণায়ু ও দীর্ঘায়ু ফিস্‌ন অণুর সংযোজন হয়েছে। তাছাড়া যে ২৫৮টা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজ আছে তা থেকে ক্রমাগত পারমাণবিক পদার্থ সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। আবার দুর্ঘটনা জনিত বা যুদ্ধে বিধ্বংস এক একটি ডুবোজাহাজ থেকে ২০ হাজার টন বা দুটো হিরোসিমা বিধ্বংসী এটম বম্বের সমপরিমাণ পরমাণু সমুদ্রজলে মিশে যায়। এভাবে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে আমেরিকার দুটো ও সোভিয়েট রাশিয়ার চারটে ডুবোজাহাজ সমুদ্রতলে ধ্বংস হয়েছে ; সমুদ্রতল তেজস্ক্রিয় করেছে। ১৯৬৬ সালে একটা হাইড্রোজেন বোমা ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়। আর একটা ঘটনায় ১৯৬৮ সালে ৩৯০ গ্রামের প্লুটোনিয়াম সমৃদ্ধ চারটে পারমাণবিক বোমা আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলা হয়। এ ছাড়াও ভূ-পাতিত কৃত্রিম

উপগ্রহও প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাগরে মিশিয়ে দেয়। এইভাবে আটটা কৃত্রিম উপগ্রহ উপরের নির্দিষ্ট কক্ষে না পৌঁছুতে পেরে পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমুদ্রে নেমে ধ্বংস পায় এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দেয়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাছ ও খাদ্যের মাধ্যমে অন্যান্য জীবজন্তু ও মানুষের নানা রকমের আধি-ব্যাধি ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়।

দুই বিশ্বশক্তির ক্রমাগত যুদ্ধ-পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে সমুদ্রজল তেজস্ক্রিয় ও মারাত্মক পদার্থে ক্রমে কলুষিত হয়ে চলেছে এবং মানুষের প্রগতির সাথে সমুদ্রও ক্রমে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এই সমুদ্র মানুষকে দিচ্ছে আবহাওয়া, বৃষ্টি, জল, খনিজ ও খাদ্য। গোটা সমুদ্র রক্ষা সম্পর্কে মানব সমাজ এখন থেকে পুরোপুরি সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্ট না হলে মানব বিবর্তনের ধারায় এক বিপর্যয় ঘটে যাবার সম্ভাবনা অতীব প্রবল।